# প্রভু নিত্যানন্দ

ভবেশ দত্ত

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
দীপান্বিতা
কার্ত্তিক-১৩৬৩

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীসুরেশ দাশ
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/৬, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

॥ প্রচ্ছদপট ॥
শ্রীমৃণাল চক্রবর্তী

॥ মুদ্রণ ॥
যশোদা রাণী মাইতি
লিপি মুদ্রণ
৩৮ নং, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

## প্রথম কথা

'নিত্যানন্দ' এই নামের মধ্যেই এর এক অপূর্ব্ব অর্থ নিহিত আছে। নিত্য বস্তুতে যার আনন্দ তিনিই একমাত্র নির্দোষ আনন্দের অধিকারী। নিত্যানন্দ মনন, নিত্যানন্দ স্মরণ আমাদের মত ত্রিতাপ ক্লিষ্ট, সদা অভাবগ্রস্ত মানুষকে যে অনেকটা শান্তি দিতে পারে সে বিশ্বাস আর দশজনের মত আমিও করি। কাউকে জানতে গেলে বা অনুভব করতে গেলে চাই সাধনা। চাই আরাধনা। কিন্তু দুঃখ কষ্ট, চিন্তা ভাবনার তীরে বসে তা পারি কই? এই সাধন বিহীন যুগে আমরা দিশেহারা, পথভ্রষ্ট। এটা নাকি বিজ্ঞানের যুগ! কিন্তু পৃথিবী কোন কালে বিজ্ঞান ছাড়া ছিল? বিজ্ঞানের দুই ধারা। এক জড়বিজ্ঞান আর এক চৈতন্য বিজ্ঞান। ভারতবর্ষে চিরকালই দুই বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল। কিন্তু যাঁরা চৈতন্য বিজ্ঞানের উপাসনা করছেন তাঁরা শান্তির পথযাত্রী হয়েছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন—যে একবার মিছরির পানা খেয়েছে সে কখনই চিটে গুড়ের পানা মুখে দিতে পারে না।

যিনি চৈতন্য বিজ্ঞানী তাঁর কখনও জড় বস্তুতে আপত্তি হতে পারে না। নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব যেন টাকার এ পিঠ ও পিঠ। চৈতন্যদেব যেন কাগজ আর নিত্যানন্দ তার ওপর অক্ষর। তাই নিত্যানন্দের হাটে ঘুরতে গিয়ে চৈতন্যদেবকেও সাথী করতে হয়েছে। বাল্যের, কৈশোরের ও যৌবনের নিত্যানন্দ যেন উত্তাল তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত সর্ব্বপাপহরা মা গংগা, পরে নিত্যানন্দ রূপ গংগা শ্রীচৈতন্যরূপ মহাসমুদ্রে লীন হয়ে যায়।

আমাদের শাস্ত্র। ঋষিবাক্য যে কত সত্য, অভ্রান্ত তা আমরা যুগ যুগ ধরে কতকগুলো আচরণ বলি। আদর্শস্থানীয় মহাপুরুষ

জীবনী থেকে বুঝতে পারি। নিত্যানন্দের জীবনালেখ্য তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যদি কালে কালে, যুগে যুগে এই রকম আচার্য্যের দেখা না পেতাম তাহালে আমাদের ধর্ম্ম, শাস্ত্র সব মরাকাগজের স্তূপে পরিণত হোত। তাহলে এমন শ্রেষ্ঠ ভবরোগের ওষুধ এবং সবার ওপর এমন অমৃত ধারার সন্ধান কি করে পেতাম। তাই এঁরা একজন এক একটা জীবন্ত শাস্ত্র।

প্রভু নিত্যানন্দের মূর্ত্তি আমি গড়তে চাইনি, যাঁকে ডাকতে পারিনি, যাঁকে বাঁধতে পারিনি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করি কি করে? শুধু শূন্য মনে তাঁকে স্মরণ করেছি মাত্র। যাঁকে দিতে কিছু পারিনি, তাঁর কাছে কিছু চাই কি করে—তাই বাইরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করা ছাড়া আর উপায় কি।

প্রকাশক বন্ধু শ্রীসুরেশ দাস অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রভু নিত্যানন্দকে প্রকাশ করেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। শিল্পী শ্রীমৃণাল চক্রবর্ত্তী হৃদয়ের সমস্ত রঙ উজাড় করে দিয়ে প্রভু নিত্যানন্দের অঙ্গসজ্জা করেছেন। প্রভু নিত্যানন্দের কৃপায় তাঁর শিল্পসাধনা আরও সমৃদ্ধ হোক এই কামনা করি। যে সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি তা হচ্ছে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, ভক্তিতত্ত্বসার ও প্রভাসখণ্ড।

কামারপাড়া
রানাঘাট
নদীয়া

ভবেশ দত্ত

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অমৃতের সন্তান মানুষ অমৃত তত্ত্বেই তার একান্ত অধিকার। অজ্ঞান কবলিত হয়ে নিজের স্বরূপকে ভুলে অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত থেকে বিষয় বিষে জর্জ্জরিত হয়ে যখন বেশীর ভাগ মানুষ ছটফট করে, সেই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় থেকে মানুষকে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত কোরে ভূমানন্দের যিনি আস্বাদন করান, সহজ-সরল পথের মাধ্যমে যিনি এহেন প্রকৃত মানবদরদী বন্ধু, তার সম্বন্ধে জানতে হলে পাতা ওল্টালেই দেখতে পাবেন।

নিত্যবস্তুতে যিনি আনন্দ পান তিনি নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ কোন ব্যক্তি নন, উনি আত্মার বিশেষণ সুতরাং সেই বিশেষ বিশেষণে ভূষিত হওয়ার অধিকার মানব মাত্রেরই আছে যা আমরা হাড়াই পণ্ডিতের ছেলে নিত্যানন্দের মধ্যে দেখতে পাই।

প্রভু নিত্যানন্দের দ্বিতীয় সংস্করণ কোনদিন প্রকাশিত হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কারণ বর্তমান যুগে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন যাপনের চিন্তায় এমনি বিভোর যে দেব-দেবতা সাধক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে জানাবার সময় তাদের মেলেই না। প্রভু নিত্যানন্দের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ এই ভেবে আনন্দ দিচ্ছে যে এই আবর্ত্তণ বিবর্ত্তনেরযুগে আজও মানুষ তার সৎচিন্তা ও সৎসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়নি। ধর্মকর্ম, পূজার্চ্চনা, জপতপ, ধ্যান-ধারনা মানুষের মন থেকে কোন দিনই ধুয়ে-মুছে যাবে না। সুখেও ভগবান, দুঃখেও ভগবান—ভগবানের কথা ভুলে থাকার শক্তি আমাদের নেই।

ভোলানাথ প্রকাশনীর ভক্ত প্রকাশক সুরেশ দাশ মহাশয় অত্যন্ত ভক্তি-সহকারে ও শ্রদ্ধাভরে সাধক মহাপুরুষদের জীবনী প্রকাশ করে চলেছেন একের পর এক, লাভ লোকসানের হিসাব না রেখে। এতে প্রমাণীত হয় তিনি পমরককরুণাময় ভগবানের একজন পরম ভক্ত।

শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে সারাজীবন যেন এই ভাবে ভগবানের সেবায় কাটাতে পারেন।

কামারপাড়া
পোঃ—রাণাঘাট
নদীয়া

ভবেশ দত্ত

## আমাদের অন্যান্য ধর্ম পুস্তক

তারাপীঠের সাধক

শক্তিপীঠের সাধক

সাধক হরিদাস

সাধক তুলসীদাস

সাধক সর্বানন্দ

পরমহংস নিগমানন্দ

# প্রভু নিত্যানন্দ

॥ প্রথম

বাপ-মা নাম রেখেছিলেন কুবের।

কেন যে রেখেছিলেন তা কে জানে। কুবের তো ধনাধিপতি, ঐশ্বর্য্যের মালিক সে। তবে! এমন বিরাট একটা অবস্থাও তো বাপ-মায়ের নয়। বিঘে বিঘে জমি জায়গাও নেই। আম কাঁঠালের বাগানও নেই। গরীব হাড়াই পণ্ডিত, স্ত্রী পদ্মাবতী, আর তিন চারটে ছেলে নিয়ে কোনমতে দিন কাটান। স্বভাব ভাল তাই অভাব আছে। দেবদ্বিজে ভক্তি আছে তাই শক্তি কম। গ্রামে সবাই বেশ মান্য-গণ্য করে তাই মাথা নীচু করেই চলতে ভালবাসেন। সদানন্দময় পুরুষ।

বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামের হাড়াই পণ্ডিতের নাম বললে সবাই চেনে—কেউ হয়তো বলবে, বড় ঠাণ্ডা মানুষ। কেউ হয় তো বোলবে, হ্যাঁ, মানুষের মত মানুষ যদি একচাকায় কেউ থাকে তাহলে সে হাড়াই পণ্ডিত।

কিন্তু ধনাধিপতি কুবেরের এ কি অবস্থা!

মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে কেন? অমন মানুষের ধুলায় গড়াগড়ি দিলে কি মানায়? মাটি মেখে ওর কি শান্তি, নাকি মাটির

তলাতে রেখে এসেছে কোন হারানো জিনিস, যা থেকে-থেকে তার মনে পড়ে—আর মনে পড়লেই ধুলায় লুটায়।

পদ্মাবতী ছুটে আসেন।

—ওরে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিস কেন, উঠে আয় বাবা।

কুবের শুধু চাৎকার করে কাঁদে।

চোখের জলে শুকনো মাটি ভিজে যায়।

পদ্মাবতী হাত ধরে তুলতে যান।

কুবের বলে ওঠে—মা, শূধন আমার বাসুদেব ভেঙে দিল কেন?

পদ্মাবতী অবাক হয়ে যান—বাসুদেব? সে আবার কিরে?

—কেন ঐ তো কাদা দিয়ে তৈরী করেছিলাম, আর একটু বাদেই ও যাবে বিয়ে করতে।

—কি বলছিস? কাকে বিয়ে করতে যাবে?

—বারে, ওদিকে যে দেবকী সেজেগুজে বসে আছে।

চমকে যান পদ্মাবতী।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবেন তা কে জানে।

কুবের আবার আপন মনে উঠে এসে কাদা দিয়ে বাসুদেব তৈরী করে।

পদ্মাবতী ভাবেন—এ আবার কি খেলা কুবেরের! এ কোন খেলায় মেতেছে সে। আরও তো আছে অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, কিন্তু এমন খেলা তো কাউকে খেলতে দেখিনি।

কুবের আপন মনে বাসুদেবকে সাজায় আর বলে—বড্ড দেরী হয়ে গেলো। শূধনটাই সব নষ্ট করে দিল। বিয়েটা ভেঙে দেবার মতলব ছিল ওর। এ বিয়ে ভাঙে এমন লোক কে আছে, তার মাথায় বাঁশ ভাঙবো না।

কুবের হেসে ওঠে।

এমন সময় শূধন এসে অপরাধীর মত তার সামনে দাঁড়ায়।

কুবের বাসুদেবকে সাজাতে সাজাতে বলে—কিরে বেটা কংশ, আবার কি মতলব নিয়ে এসেছিস রে!

শৃধন কোন কথা বলে না—

কুবের এবার যেন চীৎকার কোরে ওঠে—এবার আর সুবিধে হবে না। ঐ দেখ কারাগার তৈরী করিয়েছি। কৃষ্ণকে যে শেষ করবে সেটা আর হচ্ছে না, তার আগেই বাসুদেবকে দিয়ে কৃষ্ণকে সরিয়ে দেবো।

দেখি তোর কারাগার—

কেনরে, কৃষ্ণকে বুঝি চুরি করে নিয়ে পালাবি?

—বিশ্বাস কর, আমি কিছুই করব না।

একটা কঞ্চির খাঁচা দেখিয়ে বললে—ঐ তো দেখতে পাচ্ছিস নে?

কুবের কিছুক্ষণ চুপ কোরে থাকে।

শৃধন আপন মনে খাচাটায় শক্ত করে বাঁধন দেয়।

চারটে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে মুখে কালিঝুলি মেখে কদাকার সাজ সেজে এসে কুবেরের কাছে বলে—দেখ ঠিক হয়েছে কিনা!

কুবের সবার দিকে চেয়ে একটু বিরক্তির সুরে বলে—এই, তুই বক রাক্ষস, আর তোরা অঘ, ধেনুক আর তাড়কা! এইবার তোদের শেষ করব।

হঠাৎ সে হুংকার দিয়ে ওঠে—শৃধন, কোথায় আমার শিখিপুচ্ছ, কোথায় আমার বাঁশী। কোথায় আমার নূপুর। কোথায় আমার সুদর্শন।

কুবেরের চীৎকার শুনে পদ্মাবতী এসে ঐ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ান।

পদ্মাবতী বলেন—ওরা পালালো কেনরে?

—বারে আমি যে ওদের বধ করব।

—কেনরে?

—ওরা বক, অঘ, ধেনুক আর তাড়কা রাক্ষস।

কুবের একটু চুপ করে থেকে বলে —মা, এবার মল্লারপুরের মেলা থেকে একটা বড় সাপ কিনে দেবে?

—সাপ কি হবে রে?

—বারে! কালিয় দমন করব না?

পদ্মাবতীর সারাদেহে মনে যেন একটা শিহরণ খেলে যায়। চোখের কোণ ছুটোও বুঝি চিক্ চিক্ কোরে ওঠে। মুখে কোন কথা সরে না।

একপাল গরু ধুলো উড়িয়ে চলেছে গাঁযের পথ দিয়ে।

কুবের বলে ওঠে—মা, আমাকে সাজিয়ে দেবে না। আমার যে গোষ্ঠে যাবার সময় চলে যায়!......

পদ্মাবতী কুবেরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠেন—এসব তুই কি বলছিস বাবা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!

কিন্তু কে শোনে পদ্মাবতীর কথা।

কুবের তখন জ্ঞান হারিয়ে মায়ের বুকে।

পদ্মাবতী চোখে-মুখে জল ছিটান আর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন।

কুবের চোখ মেলে তাকায়।

পদ্মাবতী বলেন—কথা বল্ বাবা।

কুবের ধীরে ধীরে বলে —কেন মা, আমার কি হয়েছিল।

পদ্মাবতীর মুখে এবার হাসি দেখা দেয়—ওমা, তুই যে এতক্ষণ বক রাক্ষস বধ করছিলি।

কুবের শুধু ফ্যাল ফ্যাল কোরে মায়ের দিকে চায়।

কোন জবাব দিতে পারে না।

হ্যাঁরে অমন কোরে তাকিয়ে আছিস কেন, কি হয়েছিল?

কুবের তবুও কোন উত্তর দেয় না।

পাড়ার লোক নানান কথা বলে।

কেউ বলে, অপ-দেবতা ভর করেছে, কেউ বলে, ভূতের ওঝা দেখাও, কেউ বলে, বিকার।

পদ্মাবতীর আশংকা হয়, হয়তো এর মধ্যেই কোন একটা হবে।

হাড়াই পণ্ডিত সবকিছু শুনে বলে—যা হবার ঠিকই হয়েছে। ওর জন্য কোন চিন্তা নেই।

পদ্মাবতী চুপ করে থেকে বলেন—তাই বলে চুপ করে থাকবে।

হাড়াই পণ্ডিত মুখটা একটু নীচু করে বলেন—ছোটবেলা থেকে ওর যা খেলা দেখছি তা 'ভগবান' 'ভগবান' খেলা। কোন মেলায় গেলে সব পুতুল ফেলে দিয়ে ও কৃষ্ণ-রাধিকার যুগল মূর্তি কেনে, কোন দেবস্থানে গেলে ও সব কিছু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। এসব দেখে মনে হয়, সবই বুঝি ওর চেনা। ঐ দেব-দেবতা, ঐ পূজার্চ্চনা সবই বুঝি ওর পরিচিত।

একটু থেকে তিনি বলেন—ওর জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না। যে খেলায় ও মেতেছে সেই খেলাই ও যে খেলতে এসেছে। ওকে বাধা দিও না।

আর একদিনের ঘটনা। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। এক-চাকার পথ-ঘাট সন্ধ্যার পরই প্রায়ই নিঝুম হয়ে আসে। গ্রাম পাড়াগাঁ। কেউ হয়তো কোন কাজে মল্লারপুর যায়। কেউ হয় তো মামলা-মোকর্দমা কাজের জন্য রামপুরহাট যায় আর কেউ বা ৺তারাপীঠ যায় মা তারার পূজো দিতে। আট-নয় মাইলের মধ্যেই এ গাঁয়ের সব কিছু। তাই সন্ধ্যার পর রাত-বিরেতে তারাই হয়তো কেউ কেউ চলাফেরা করে। গাঁয়ের দেবমন্দিরে কেউ হয়তো বা আরতি দেখতে যায়।

কিন্তু কুবের কই ?

সন্ধ্যে তো উতরে গেলো।

পথ-ঘাট অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

সবাই খুঁজতে বের হোল। পদ্মাবতীর চোখে জল দেখা দেয়।

যা নিয়ে কুবেরের খেলা সেই কৃষ্ণমাধবকে ডাকতে লাগলেন। হাড়াই পণ্ডিত এ পাড়া ও পাড়া খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

শুধন জানেনা, তার খেলার সাথী ভুবন. রাধানাথ, তেঁতলে কেউ জানেনা সে কোথায়।

হাড়াই পণ্ডিত খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ফিরে এলেন। হঠাৎ পদ্মাবতী দেখতে পেলেন রান্নাঘরের পিছনে কুবের বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল তুলে উঁচু ঢিবিটার ওপর বসে আছে। রাত কি দিন তাও তার খেয়াল নেই।

পদ্মাবতী ছুটে গিয়ে তাকে ধরে তোলেন।

সারা অঙ্গে তার ঘামের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, কোন জ্ঞানই নেই। বাড়ী এনে জল ঢালতে ঢালতে যখন তার জ্ঞান হোল তখন সুরু হলো কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কি কান্না!

পদ্মাবতী তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন—কাঁদছিস কেন বল, ক্ষিধে পেয়েছে?

—কোথায় আমার গিরি গোবর্ধন! মা আমি তো তাই এতক্ষণ ধরে বসেছিলাম, শক্তিশেলের আঘাতেই তো মা আমার জ্ঞান ছিল না।

আর কোন কথা নয়!

মায়ের কোল থেকে উঠে একছুটে একেবারে রান্নাঘর!

হাড়াই পণ্ডিত তখন ওপাশের মাটির দাওয়ায় বসে উচ্চঃস্বরে পাঠ করছেন—

"হরেনাম হরেনাম হরের্ণামৈব কেবলম্
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

এ ছাড়া কোন উপায় নেই কলির জীবের। হরিনাম সংকীর্তনই

সর্বমংগলের ও সর্বসিদ্ধির নিদান। ভক্তি সাধনা এই একমাত্র সাধনা জন্ম-মৃত্যু-জরা সব পারেই এই নাম—এই নামে ভবপারাপার, এই নামে দুঃখ জয় হয়। এই নামেই ভক্তি। এই নামেই মুক্তি। সর্ব-রোগের এই নামই বিশল্যকরণী—শোকতাপাচ্ছন্ন মানুষের এই নামই তো মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ। মনে মনে বলো, ধীরে ধীরে বলো, উচ্চৈঃস্বরে বলো, বলতে না পারো কান পেতে শোন, মনের সব জানালা খুলে দাও, দেহের সব দরজার আগল খুলে দাও, ও নাম যে আকাশে-বাতাসে। ঐ নামেই তো সব হাসছে ভাসছে কাঁদছে। বলো, বলো, আরও বলো—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ
যাঁহার প্রকাশে সর্বজগৎ আনন্দ।"

রাতে খাওয়ার পর হাড়াই পণ্ডিত জপ করতে করতে কুবেরকে ডাক দিলেন।

কুবের কাছে আসতেই তিনি বললেন—হ্যাঁরে, গিরি গোবর্ধন কিরে?

কুবের জবাব দেয়—তা তো জানিনে।

—শক্তিশেল, কংশের কারাগার, এসব তুই জানলি কি করে? কে তোকে শেখালো।

—তা তো জানিনে বাবা, আমি তো এসব কিছুই জানিনে।

—তবে বলিস কি করে, বারোবছর বয়স হল লেখাপড়াও তো বেশী কিছু শিখলি না, শেখবার চেষ্টাও করলি না। তোর কি হ'বে?

কুবের মিটিমিটি হাসে—

যেন ওর কোন ভাবনাই নেই। সকল ভাবনার আর এক পারে যেন সে বসে আছে। ভাবতে হয় তোমরা ভাবো, সে ভাববে কেন, সে তো ভাবতে আসেনি, এই ভাব আর কি।

হাড়াই পণ্ডিত চেয়ে চেয়ে দেখেন।

কুবের শুধুই হাসে

## । দ্বিতীয় ।

ভোরে নিত্যস্নান করেন হাড়াই পণ্ডিত। স্নান সেরে জপ আহ্নিক শেষে পাঠ শুরু করেন। সেদিনও তিনি সুর কোরে পাঠ করছিলেন :

জ্বলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
তোমার স্মরণহীন পাপ জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোমিষ্টে দিয়া তোর॥
শচীর নন্দন বাপ কৃপা করো মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখো ভক্ত ঘরে॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্বজগতে নিস্তার॥

কুবের তখন একমনে বাবার পাঠ শুনছে! মুখের দিকে চাইলে মনে হয় সে যেন বাবার বলার সাথে সাথে মুখস্থ করছে। স্কুলের পড়ায় তার কোনরকম স্পৃহাই নেই অথচ বাবা যখন পাঠ শুরু করেন তখন তার মন আর অন্যদিকে যায় না।

এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে উঠানে দাঁড়ালেন।

প্রথম দৃষ্টি তাঁর কুবেরের দিকে পড়ে!

তিনি যেন চমকে যান।

এ কে?

এমন রূপ তো তিনি কোথাও দেখেন নি—এমন গায়ের রং এও

তো তাঁর চোখে পড়েনি। মাথায় এমন চাচর কেশ, চোখ দুটো যেন নীলাঞ্জন মাখা। দুচোখের কালো ভুরুতে যেন ভ্রমরের গুঞ্জন। কে এই ছেলেটা ?

সন্ন্যাসীকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাড়াই পণ্ডিত নেমে এসে প্রনাম করলেন ও যত্নসহকারে পা ধুইয়ে দিয়ে মাটির দাওয়ায় একটা আসন পেতে দিলেন।

সন্ন্যাসীর দৃষ্টি কিন্তু ঘুরেফিরে ঐ কুবেরের দিকে। পরে বলেন,—এ ছেলেটি কেরে ?

হাড়াই পণ্ডিত হাতজোড় করে বলে,—প্রভু! ঈশ্বর দিয়েছেন, ওটা আমার ছেলে।

—তোমার ছেলে !

—দানের জিনিসে দাবী আমার কিছুই নেই, তবে আমার স্ত্রী পদ্মাবতী ওর গর্ভধারিণী, আর আমি ওর জনক।

—কি নাম ছেলের ?

—কুবের।

সন্ন্যাসী হাসতে থাকেন।

পরে বলেন—যে ওর নাম রেখেছে সে ভুল করেছে।

হাড়াই পণ্ডিত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

সন্ন্যাসী কুবেরের দিকে চেয়ে বলেন—ওর নাম নিত্যানন্দ। যে সদানন্দময় সেই তো নিত্যানন্দ, তাছাড়া ওর মন তো সব সময় নিত্যের প্রতি ছুটে চলেছে; ওর কখনও অন্য নাম মানায়, না হোতে পারে।

হাড়াই পণ্ডিত বলেন,—বেশ! আপনার যখন ইচ্ছা তখন ঐ নামেই আমরা ডাকবো।

—আমার ইচ্ছা! কে বোললে ?

তবে—

সন্ন্যাসী হাসেন

রতন না হোলে রতন চিনতে পারে না। সোনার কারবার যে করে সেই তো সোনা চিনতে পারে। ঈশ্বর-প্রেমে যে হাবুডুবু খাচ্ছে সেই তো বোঝে প্রেমের কথা। ভক্তিরথের যে সারথী সেই তো চেনে ভক্ত। নামের দরিয়ায় যে শুদ্ধ ভক্তির খেয়া পারাপার করছে সেই তো বোঝে কে পারাণীর কড়ি দেবে আর কে ফাঁকি দেবে।

কুবের হোল নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ হোল নিতাই।

যেন কুঁড়ি থেকে ফুল।

ফুল থেকে একেবারে ফল।

সন্ন্যাসী বলেন, তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে।

হাড়াই পণ্ডিত বলেন,—আমি গরীব, আপনাকে ভিক্ষা দেবো সে সামর্থ্য আমার নেই। তবুও আপনি বলুন আমার সাধ্য থাকে নিশ্চয়ই দেবো।

উঁহুঃ, আগে কথা দিতে হবে।

—প্রতিশ্রুতি দিলাম, দেবো।

—তোমার এই ছেলেটিকে আমায় ভিক্ষা দিতে হবে। ভয় নেই, চিরদিনের মত নয়। সামান্য দিনের জন্য, তারপর আবার মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে আসবে।

হাড়াই পণ্ডিত কোন জবাব দিতে পারেন না।

পদ্মাবতী জবাব দেন,—হ্যাঁ, তাই হ'বে। ওকে পেটে আমি ধরেছি সত্যি, কিন্তু বুকে ধরে রাখি এমন সাধ্য আমার নেই। আর আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি যে, ওকে আমি ধরে রাখতে পারবো না।

পদ্মাবতীর এ কথাগুলো বলবার সময় কোনরকম অস্থিরতা দেখা গেল না। কোনরকম চাঞ্চল্য এসে তাঁকে অচঞ্চল করতে পারলো না। চোখ দুটোও জলে ভরে এলো না।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিতাই ঘুরতে থাকে তীর্থ থেকে তীর্থে। যেন এক মহান পথিক তার জীবন ব্যাপী পথ পরিক্রমায় বের হয়েছে। কোথায় গিয়ে থামতে হ'বে তা জানে না, শুধু চলেছে তো চলেছেই। তীর্থময় ভারতবর্ষ। দেবতাময় ভারতবর্ষ। পরম করুণাময়ের পাদস্পর্শ করে যে ভারতবর্ষকে ঘিরে বয়ে চলেছে গংগা, যমুনা, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র, অজয় আর দ্বারকা নদী সেই দেশের তীর্থে তীর্থে মাথা ছুঁয়ে আবার পথ চলা কি এতই সহজ, কজন পারে তা?

## ॥ তৃতীয় ॥

তারাপীঠ থেকে শুরু কোরে নলহাটি, বক্রেশ্বর অট্টহাস, বৈদ্যনাথ গয়া, কাশী, প্রয়াগ। সেখান থেকে মথুরা।

মথুরায় এসে নিতাই যেন কেমনধারা হয়ে যায়।

চারিদিকে শুধু অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এখানকার পথ-ঘাট নীল বনরাজি, সবুজ ঘাস সবই যেন তার চেনা। যমুনার ঘাটে ঘাটে সে সাঁতার কাটে, আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ে। প্রাণ ভরে সে ডুব দেয় যমুনায়। জল ছিটায়।

যমুনাও যেন অনেকদিন পর তার হারানো জিনিস পেয়ে সমস্ত দৌরাত্ম্য অম্লান বদনে সহ্য করে।

নীল যমুনার জলের দিকে চেয়ে চেয়ে তার যেন পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে।

ঐ তো সেই গোবর্ধন পর্বত।

নিত্যানন্দ কেন জানি গোবর্ধন পাহাড়ের ওপর গিয়ে বসে থাকে।

তারপর এলেন বৃন্দাবনে।

ধীরে সমীরের পাশ দিয়ে একরকম ছুটতে ছুটতে এসে যমুনার জলে আছড়ে পড়ে। নীল যমুনার কাজল কালো জলে ডুব দেয় আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে কাঁদে। 'কৃষ্ণ কই' 'আমার কৃষ্ণ কই' শুধু তার কণ্ঠে এই দুটি কথা। তার দু'চোখ বেয়ে বয়ে যায় নীল যমুনার মত অশ্রুধারা। ছুটে যায় নিকুঞ্জবন নিধুবন। কিন্তু কৃষ্ণ কই? বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ কোথায় গেল? পথের দু'পাশে গাছ-গাছড়া জড়িয়ে ধরে আকুল স্বরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে—তোমরা কি কেউ বলতে পারো না আমার কৃষ্ণ গেল কোথায়? গরু বাছুর দেখলেই

তার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলে—হ্যাঁরে, তোরাও কি কেউ জানিস নে সে কালাচাঁদ কোথায় গেল ?…

সন্ন্যাসী বোঝে না নিত্যানন্দ কেন কাঁদে ?

চোখের জলে পথের পর পথ ভেসে যায়।

হস্তিনাপুরে আসে নিত্যানন্দ, তারপর সেখান থেকে দ্বারকা, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম।

পথ থেকে পথ।

তীর্থ থেকে তীর্থে।

"নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥"

পাহাড় থেকে পাহাড়ে।

বন থেকে বনে। এক নদী পার হয়ে আর এক নদীতে: কিন্তু কোথায় সে? এমনই দুর্লভ জিনিস 'কৃষ্ণ' যে কোটি জনম ঘুরলেও তার নাগাল পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরসে দেহমন না ভিজাতে পারলে এ ধন মেলে না। কৃষ্ণরস কি? প্রেম আর ভক্তি মাড়াই করে যে রস মেলে তাই তো কৃষ্ণরস আর তারই নির্যাস কৃষ্ণপ্রেম।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুৎ আছয়॥
কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনা যেমন অনেক রকম, প্রাপ্তিও তেমনি বহুপ্রকার।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শুদ্ধ কেন নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

চোখের জলের পথ বেয়েই দেখা হোল স্বামী শংকরারণ্যের সাথে। শংকরারণ্য অবাক হোয়ে চেয়ে দেখেন নিত্যানন্দকে।

নিত্যানন্দ বলেন,—অপরাধ যদি না নেন তাহলে আপনার পূর্বাশ্রমের নাম কি ?

শংকরারণ্য জবাব দেন—বিশ্বরূপ নাম ছিল পূর্বাশ্রমের। নবদ্বীপ বাড়ী। বাবার মাম জগন্নাথ মিশ্র। আমার একটা ভাই আছে। কেউ তাকে বলে নিমাই। কেউ বলে গৌরাঙ্গ। আবার কেউ বা বলে গোরাচাঁদ।

নিত্যানন্দ আর কোন কথা বলেন না।

কৃষ্ণ ছাড়া আর তাঁর কোন কথা নেই, কৃষ্ণ ছাড়া আর তাঁর কোন চিন্তা নেই। শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন নাম নেই।

এবার দেখা হলো মাধবেন্দ্র পুরীর সাথে।

ধ্যান জ্ঞান তাঁর কৃষ্ণ। জপ তপ তাঁর কৃষ্ণ।

স্মরণ মনন শুধু কৃষ্ণ।

আকাশ কালো করে মেঘ ওঠে।

মাধবেন্দ্রপুরী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কেঁদে ওঠেন।

নিত্যানন্দ অবাক হয়ে যায়—এত ভাব এত ভক্তি। আকাশের কোলে মেঘে যিনি কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন তিনিই তো কৃষ্ণানুগ্রহ লাভ করেন।

কালোর মাঝেই তো আলোর প্রকাশ।

মাধবেন্দ্রপুরী চোখ বুজে থাকেন।

চোখের পাতা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

নিত্যানন্দ বলেন—কত ঘুরলাম, কত কাঁদলাম, কিন্তু আপনার মাঝে আজ যা পেলাম তা আমার অমূল্য সম্পদ। মনে হচ্ছে যা পাইনি তা আজ পেলাম, যা দেখিনি তা আজ দেখলাম।

প্রেম কাকে বলে আজ দেখলাম।

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমাকে দেখাও যা কৃষ্ণকে দেখাও তাই। একসাথে আজ দুজনকে পেলাম।

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ
যাঁহার প্রকাশে সর্বজগৎ আনন্দ ॥"

মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে বিদায় নিয়ে নিত্যানন্দ চললেন সেতুবন্ধ। সেখান থেকে রামেশ্বর নীলাচল। নীলাচল থেকে গংগাসাগর। তারপর আবার মথুরা বৃন্দাবন।

কতদিন, কত মাস, কত বছর যে কেটে গেলো তা কে জানে। নিত্যানন্দরও অত হিসাব নেই। একটা দিন যায় আর ভাবে, পেলাম না। আর একটা দিন যায়, ভাবে—হারালাম। দিনের পর রাত যায় আর ভাবে—আশা মিটলো না, আর কবে দেখা পাবো। সময় যে চলে যায়। জীবনও তো পায় পায় এগিয়ে চলেছে মহাকালের বাঁধাঘাটে। তবে! দিন রাতকে যদি বেঁধে রাখতে পারতো তাহলে হয়তো একটু আশা ছিল। বজ্রের মাটিতেই নিত্যানন্দের মিলন হোল ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে।

লোহার সঙ্গে যেন চুম্বকের যোগাযোগ।

ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দকে দেখলেন ভালো করে।

পরে তিনি বললেন—এখানে কাকে চাও! কার জন্য তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

—কৃষ্ণের দর্শন চাই! বলুন আমি তাঁকে কোথায় পাবো?

—এখানে কোথায় তাকে পাবে? সে কি এখানে আছে?

—তবে কি দেখা পাবো না। বলুন কোথায় গেলে তাঁকে পাবো?

আমি জনম জনম তাঁকে খুঁজে বেড়াবো, বলুন কোথায় আছেন লুকিয়ে কৃষ্ণ!

—তাঁকে পেতে হোলে যেতে হ'বে নবদ্বীপ।

—কি নামে তিনি সেখানে আছেন।

—নিমাই পণ্ডিত।

—কে তাঁর বাপ মা?

—বাবা জগন্নাথ মিশ্র, মা শচী দেবী। এবার কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে নয়। মথুরাতেও নয়। কৃষ্ণলীলা নবদ্বীপে। কৃষ্ণ তোমার যে এবার নিমাই সেজেছে। যে নিমাই সেই তো কৃষ্ণ। ঈশ্বরপুরী হাসেন—তুমি কে।

নিত্যানন্দের সারা দেহমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—নবদ্বীপে। নবদ্বীপের পথই এবার কৃষ্ণের পথ। নবদ্বীপের পথই এবার মুক্তির পথ। প্রেম ভক্তি আনন্দ যা কিছু সবই এবার মিলবে নবদ্বীপে। নিমাই এবার সে হাটের ইজারা নিয়েছে। ভক্তির পসরা নিয়ে প্রেমের বেচাকেনা যারা করতে চায় তাদের এবার যেতে হবে সেই হাটে। নিত্যানন্দ অনেকক্ষণ পর জবাব দিলে—আজ্ঞে, আমি নিত্যানন্দ !

ঈশ্বরপুরী হাসেন—আমাকে ফাঁকি দেওয়া কি অতই সোজা। আমি যে সবই জানি। ব্রজের বলরাম এবার নিত্যানন্দ। বলরাম ছাড়া যেমন কৃষ্ণ অন্ধকার, তেমনি এবার নিতাই ছাড়া নিমাই নেই। যেখানে নিমাই সেখানে নিতাই, নবদ্বীপের প্রেমের হাট কি একা সামলানো নিমাই এর কাজ, তাই তো নিতাইকে সঙ্গে এনেছে। এবার ফাঁকির কারবার যারা করেছে, তাদের ব্যবসা বন্ধ কোরতে হ'বে। এবার বাকির কারবার। ও দুজনকে নগদ কিনতে পারে এমন মানুষ তো দেখিনে।

'ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম
কোটি সূর্য চন্দ্র জিনি দোহার নিজধাম ॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ ॥"

ব্রজরাজ এবার নবদ্বীপে প্রকাশ। যমুনার ধারা এবার গংগায়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা এবার নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া।

নবদ্বীপের পথ ধরে নিত্যানন্দ।

কোথায় নবদ্বীপ। কত দূরে।

চলেছে নিত্যানন্দ—

কি মধুর আবেগ। নীলাম্বর জড়ানো বিরাট দেহ। মাথায় নীলবস্ত্র। চোখের ভ্রূতে নীলাঞ্জন। মুখে হাসি। হৃদয়ে গভীর এক আলোড়ন। কি অপূর্ব বেশ!

জ্ঞান চলেছে মহাজ্ঞানের কাছে। ভক্তি চলেছে ভক্তির আধারে। প্রেমচলেছে মহাপ্রেমের দুয়ারে।

## ॥ চতুর্থ ॥

অবশেষে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এলেন।

পথে যাকে পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন—ওগো, তোমরা গোরাকে চেনো। কোন্ পথে গেলে তাঁর দেখা পাবো। আমি যে কতদিন তাঁকে দেখিনি, সেই যে কবে ছাড়াছাড়ি হয়েছি তারপর আর তাঁকে পাইনি, বল কোথায় আছে সে?

চোখ দুটো তার জলে ভরে আসে।

নন্দন আচার্যের বাড়ীতে এসেই উঠলেন নিত্যানন্দ।

ওদিকে নিমাই তখন গভীর ভাবে নিমজ্জিত। অন্তরে টের পেয়েছেন কে যেন এসেছে। তাকে যে আসতে হবেই নইলে কলির জীবের উদ্ধার নেই—নিত্যানন্দই যে এবার আনন্দ বিলাবার ভার নিয়েছে। তিনি বললেন—তোমরা সবাই শোন। নবদ্বীপের ধূলিকণা আজ ধন্য হয়েছে। এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এই নবদ্বীপে।

আমি তারই প্রতিক্ষায় ছিলাম। তোমরা খুঁজে দেখো সে কোথায় আছে। আমি জানি সে এই নবদ্বীপেই কোথাও আছে।

একটু থেমেই নিমাই আবার বললেন—কাল স্বপ্নের ঘোরে আমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে।

আমি বললাম—তুমি কে? তোমাকে তো এর আগে কখনও দেখিনি।

জবাব দিলে—তা আর চিনবে কি করে। ভাইকে ভাই চিনতে পারে না বড় মজার কথা। তোমরা সবাই যাও তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মন আমার বড় চঞ্চল হোয়েছে।

নিমাইয়ের ভাবাবেশ হলো।

প্রাণভরে যে যাকে চায় তার জন্যে মন বুঝি এমনি করেই ব্যাকুল

হয়! ডাকতে হবে। কেমন করে ডাকতে হয় সেই সাধনা করতে হবে। কেমন করে কাঁদতে হয় জানতে হবে। কেমন করে কাঁদতে হয় সে জ্ঞানও চাই। পাহাড় হয় তো তাতে টলবে না, কিন্তু ভগবান টলবেন। ভক্তের ডাক ভগবান শুনবেনই। নির্মল আনন্দ যেখানে সেখানেই তো তিনি। আত্মসমর্পন যেখানে সেখানেই তাঁর স্থিতি। তিনি তো কাছেই আছেন। তাঁকে দেখার জন্য, পাবার জন্য দূরে যেতে হবে না। নদী পাহাড় পার হয়ে পারের কাণ্ডারীকে খুঁজতে যেতে হবে না। এই তো তিনি আছেন। ঐ তো তিনি আছেন—আশে-পাশে সর্বত্রই তো তিনি। মনের দুয়ারে খিল লাগিয়ে বাইরে খুঁজে কি লাভ? তিনি তো ভিতরেই আছেন। চেয়ে দেখো। কান পেতে শোন—দেখবে তিনি বসে আছেন।

''সৎচিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সান্ধনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানে।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটচ্ছা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান? পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ।
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে॥
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

নিত্যানন্দ নন্দন আচার্যের ঘরে বসে সময়ক্ষণ গুণছেন।

কই সে আসে? সেই নবজলধর শ্যাম নয়নাভিরাম গোপীবল্লভ কখন দয়া করবেন।

যারা বেরিয়েছিল খুঁজতে তারা ফিরে এসে বললে—কই

আমরা পেলাম না তো। সব খুঁজেছি সব দেখেছি কিন্তু কই তাঁর দেখা তো পেলাম না। নবদ্বীপে এমন ঘর নেই যেখানে সন্ধান করিনি। এমন কি চোর-ডাকাত বোলে যাদের জানি তাদের ঘরেও পেলাম না।

নিত্যানন্দকে বোঝে ওদের শক্তি কি? তাঁকে বোঝা কি এতই সহজ। যিনি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, সংকর্ষণ তারই অংশ। সেই বলরাম। আবার সেই বলরামই তো নিত্যানন্দ।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

চার যুগেই তাঁর লীলা। চার যুগেই তাঁর প্রকাশ।

ত্রেতায় লক্ষণ। দ্বাপরে বলরাম। কলিতে নিতাই। সেই একই মানুষ যুগে যুগে ভিন্নরূপে আসছেন।

"নিত্যানন্দের স্বরূপ পূর্বে হইলা লক্ষণ
লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন।"

নিমাই নিজেই পথে বের হোন।

মুরারী বললে—আমরা তো সব যায়গায় খুঁজেছি!

—খুঁজলে তাঁকে পেতে, খোঁজনি তাই পাওনি। অত সহজে তাঁকে মেলে না। তাঁকে পেতে হলে ঘুরতে হবে।

সবাই যেন লজ্জা পায়।

নিমাই বলেন—নন্দন আচার্যের বাড়ী দেখেছো?

কেউ তো সেখানে যায় নি, তাই সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

সবাই নন্দন আচার্যের বাড়ীর পথ ধরলো।

নিমাই চলেছেন আগে আগে।

নন্দন আচার্যের বাড়ী ঢুকতেই সবাই নিতাইয়ের হাসির শব্দ শুনতে পেলো। নিত্যানন্দ হাসছে—হাসিতে যেন মধু ছিটিয়ে পড়ছে।

নিমাই চেয়ে আছে নিতাইয়ের দিকে

নিতাইও চেয়ে আছে নিমাইয়ের দিকে।

কারও যেন পলক পড়ে না।

কি অপূর্ব দৃশ্য।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। চার যুগেই যাদের আসা-যাওয়া, কাছাকাছি থাকা তারা কি কেউ কাউকে চিনতে পারছে না!

মুখে কেউ কথা বলে না!

চোখে চোখে দেখাদেখি হয়।

নিমাই আর নিতাই।

নিতাই আর নিমাই।

দুজনেই দুজনকে চিনলো।

নিতাই এর দেখে যেন সাধ আর মিটছে না।

একি বেশ! মাথায় গোছা গোছা কোঁকড়ানো চুল। পরনে সাধারণ একটা বস্ত্র। গায়েও একটা উত্তরীয় নেই। সুঠাম দেহে অপরূপ রূপলাবণ্যের ঝিলিমিলি। চোখের মণিকোঠায় শত চন্দ্রমার আলোক বিচ্ছুরণ।

নিত্যানন্দ বারবার দেখছে আর ভাবছে—এ আবার কে! সে ধড়াচূড়াই বা কই। সেই বাঁশীই বা কই। পায়ের নুপূর তাই বা কই!

নিমাই হাত বাড়িয়ে দেয়—

এত অভিমান আর সহ্য হয় না।

নিমাই এগিয়ে আসেন।

এবার তাঁর চোখে জলের ধারা নামে।

নিত্যানন্দ চেয়ে আছে তার জলভরা চোখের দিকে।

> "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
> ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
> ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনাং ত্বমেব
> ত্বমেব সর্ব মম দেব দেব।"

"ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন
ভক্তি এই কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন।
কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণনাম মিলে
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে।"

নিত্যানন্দ অকস্মাৎ মূর্চ্ছা যায়।

অনেকক্ষণ পর যখন তার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় তখন বালকের মত কাঁদতে থাকে। মাটিতে গড়াগড়ি যায়। অবিরাম জলের ধারায় উঠানের মাটি যেন কাদা হোয়ে যায়।

প্রেমের সরোবরে বন্যা এসেছে, নিমাই এসেছে যেন স্রোত হয়ে, এবার বুঝি সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!...

নিত্যানন্দ কেঁদে চলেছে।

নিমাই এসে ধরে তুললো নিতাইকে।

নিতাই এক নিমিষেই অন্য মানুষ হয়ে গেলো।

"আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে"

নিমাই ছাড়া এমন প্রেমের কথা আর কেউ জানে না। এমন প্রেম আর দেবেই বা কে? নিমাই যে প্রেমের খনি।

নিমাই নিত্যানন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

নন্দন আচার্যের মাটির বারান্দায় নিমাই নিতাই বসল।

নিমাই নিত্যানন্দের গায়ে হাত বোলান আর বলেন.—এ জন্ম আমার সার্থক হোল, তোমাকে পেলাম। তোমাকে না পেলে এযাত্রা আমার সবই ব্যর্থ হোত। তুমি আছো তাই ভক্তিও আছে। তোমাকে পেয়ে ভক্তি কাকে বলে জানলাম। শুধু কৃষ্ণ প্রেম যার জানা আছে সেই বোঝে ভক্তি কি! কৃষ্ণ প্রেম তুমি মন্থন করেছো। কৃষ্ণ প্রেম তোমার শিরায় শিরায়। তোমার রক্তে মিশে গেছে কৃষ্ণ প্রেমের বীজ। তুমিই তো ঐ প্রেমের গুরু, তোমাকে দেখলেই কৃষ্ণকে দেখা হয়, তোমাকে জানলেই কৃষ্ণকে জানা যায়। তোমাকে চিনলেই তো কৃষ্ণকে চেনা হয়। কৃষ্ণ তোমার মাঝেই বিদ্যমান,

তাই তুমি নিত্যানন্দকৃষ্ণ। তোমাকে স্পর্শ করলে শতজন্মের পাপ ধুয়ে যায়। তোমার ছায়ায় যে এসে দাঁড়াবে তার শোক-তাপ সব ভুল হয়ে যাবে।

নিত্যানন্দ মিটিমিটি হাসে।

নিমাই বলে,—তোমাকে পেলাম আমার ভাবনা চিন্তা দূর হোল। এবার কৃষ্ণকে পাওয়ার ঠিকানা জানতে পারবো। কলির মানুষের জীবন-মরণ কাঠি তোমারই হাতে দাদা।

তুমিই একমাত্র পারবে এই সংসারের মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করতে। কলিতে মানুষের মধ্যে কোন ঈশ্বরভক্তি নেই। মায়া-মোহের কারাগারে বন্দী হয়ে আছে। তুমি এদের মুক্তি দাও। কলির জীব দিবারাত্র পাপকার্যে রত। অমানিশার অন্ধকারে এদের জ্ঞানের পথ আচ্ছন্ন। মিথ্যার খোলস দিয়ে এরা ঢেকে রেখেছে এদের বিবেককে! তুমি এদের বাঁচাও, এদের উদ্ধার করো। এদের তুমি জ্ঞান দাও, ভক্তির পথ চেনাও। আমাকে তুমি কৃপা করে কৃষ্ণপ্রেম শেখাও।

নিত্যানন্দ লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়।

এসব কি বলছে নিমাই!

কৃষ্ণপ্রেমে যে হাবুডুবু খাচ্ছে সে আবার আর একজনের কাছে চাচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম।

নিতাই বললে,—কত তীর্থে ঘুরলাম, কত কিছু দেখলাম, কত শুনলাম শুধু কৃষ্ণকে দেখলাম না। লুকানো রত্ন খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেলাম। পরে শুনলাম নবদ্বীপে এসেছে কৃষ্ণ। এবার নাকি যত পাপীতাপী উদ্ধার হ'বে, যত পতিত সব কৃষ্ণ দর্শন পাবে। মহাপতিত আমি, তাই সেই লোভে লোভে আমিও ছুটে এলাম।

সবাই দেখছে দুজনকে—

যেন রামলক্ষ্মণ, কৃষ্ণ বলরাম।

নিতাই বলে,—বাঁশী রেখে এলে কোথায়?

নিমাই জবাব দেয়,—তোমারই বা লাঙ্গল-গরু কই? ব্রজে বাঁশীর সুর এবার নবদ্বীপের খোল-করতালে। যারা শুনবে তারা বুঝবে।

॥ পঞ্চম ॥

আষাঢ় পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা। ভগবান ব্যাস এইদিন ধরায় এসেছিলেন।

নিমাই বললে,—কোথায় ব্যাস পূজা হ'বে ?

—কেন শ্রীবাসের ঘরে ?

শ্রীবাস ধন্য হয়ে বলে,—এতো আমার মস্ত ভাগ্য !

কীর্তন শুরু হয়ে যায় শ্রীবাসের আঙিনায়—

"বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
তোমা সভা সাজিয়া কৃষ্ণের অবতার
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড়ো অনাচার।"

নিমাই কাঁদে। নিতাই মাটিতে গড়াগড়ি যায়। ধূলা মাখে। শ্রীবাস অংগন ভেসে যায় কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে। খোল-করতালের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। কীর্তনের স্রোতে ধূলিকণাও যেন আনন্দে নৃত্য করে—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

কি মধুর অমৃতক্ষরা নাম। যে নামেতেই জীব উদ্ধার হয়। যে নামেতে পাপীতাপী মুক্তি পায়। যে নামেতে বৃক্ষের পাতা দোলে। যে নামেতে নীড়ের পাখী পাখা ঝাপটায় !

কলিতে নাম ভিন্ন আর গতি নেই। সাধন ভজন করতে হবে না। শাস্ত্র পাঠ করতে হবে না। শাস্ত্র ব্যাখ্যাও শুনতে হবে না। জপ, তপ, ধ্যান কিছুই লাগবে না—এই নামই জপ, এই নামই তপ, এই নামই ধ্যান, এই নাম সর্বনাম, এই নাম সর্বমোক্ষ, এই নামই ভবযন্ত্রণার একমাত্র ওষুধ। নাম করো, নাম

নিয়ে নৃত্য করো, সব শাস্ত্র এর মধ্যে। বেদ, উপনিষদ, সব এই নামের মধ্যেই।

বলো বলো উচ্চৈঃস্বরে বলো—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধাগোবিন্দ।"

নামের মাঝেই নিমাই বলে,—সে কই? যে আমাকে বৈকুণ্ঠ থেকে নিয়ে এলো—আমি জানি সে আসবে, তাকে আসতেই হ'বে। নিতাই বলে,—কার কথা বলছ? সেই ন্যাড়া অদ্বৈতাচার্য?

—হ্যাঁ, সে আসবে না?

—আসবে বইকি! তুমি যখন এসেছো, তখন সে কি আর চুপ করে থাকবে। চল, এখন যাই স্নান করে আসিগে।

নিমাই আর নিতাই দুজন গংগা স্নানে যায়।

নিতাই গংগায় নেমে সব ভুলে যায়।

ব্যাস পূজোর কি মন্ত্র? একি নিতাই তো কিছুতেই মনে কোরতে পারছে না।

নিমাই বলে,—ওঠো দাদা, যে কাজের জন্য তুমি এসেছো, সেই কাজে আত্মনিয়োগ কর। সবাইকে কোল দাও, কৃষ্ণভক্তি শেখাও, সবার শুষ্ক প্রাণে কৃষ্ণপ্রেম বারি ঢালো। কলির জীবকে তুমি পথ দেখাও।

পরম চৈতন্যময় নিত্যানন্দ!

নিত্যানন্দ চৈতন্যের ঝুলি।

নিমাই জীবের আশ্রয় আর নিত্যানন্দ সাশ্রয়। নিমাই জীবের পথ, আর নিতাই সেই পথের চালক। এ পথে না গেলে জীবের গতি নেই, এ পথে না গেলে জীবের ইষ্ট মিলবে না। এ পথে না গেলে জীবের মোক্ষলাভ হবে না।

বাড়ী এসে নিমাই ডাকে,—মা, এসো, দেখবে কাকে ধরে এনেছি! শচীমাতা ব্যস্ত ভাবে বলতে বলতে আসেন—কে রে আমার বিশ্বরূপ এলি নাকি?

নিমাই বলে,—চিনতে পারছো না, এইতো আমার দাদা বিশ্বরূপ।

শচীমাতা নিতাইয়ের চোখ-মুখে হাত বোলান আর বলেন,—বল্‌না তুই আমার বিশ্বরূপ?

নিতাই বলে,—হ্যাঁ মা—আমি তোমার আর এক ছেলে, আমরা তো নিমাই নিতাই দুই ভাই।

শচীমাতা নিতাইয়ের হাত ধরে বুকে টেনে এনে বলেন,—বল্, তুই আমার নিমাইকে দেখবি, ওর কাছছাড়া হবিনে?

নিতাই শচীমাতার বুকে মুখ লুকিয়ে বলে,—মা, তোমার কি কিছুই মনে নেই? আমরা দুজন কবে কোন্ যুগে ছাড়াছাড়ি হলাম। মা, ওমা, একবার মনে করো মা, তুমি কে ছিলে। তুমিই তো আমাদের বনে পাঠিয়ে দিয়ে কেঁদেছিলে মা। তারপর আর একবার তুমিই তো গোষ্ঠে যাবার সময় আমার হাতেই ওকে সঁপে দিয়েছিলে, আবার এ যুগে তুমিই আবার বলছ ওকে দেখো।

শচীমাতা জ্ঞান হারান।

ঈশ্বর একজনই, দুই নয়। বিভিন্নরূপে তিনি আসেন এক এক সময়। একই দেবতা তার কত রূপ। কখনও রাধাকৃষ্ণ, কখনও লক্ষ্মীনারায়ণ, কখনও শ্যামসুন্দর, কখনও গিরিগোবর্ধন, কখনও গোপাল, কখনও শ্যাম, কখনও শ্যামা।

এ যুগে নিমাই নিতাই—

এ যুগে গৌরপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া—

শ্রীরাধার আর এক বেশ বিষ্ণুপ্রিয়া।

কৃষ্ণই তো সকল জীবের মূল। সকল জীবের একমাত্র আশ্রয়। ও আশ্রয় যার নেই তার কিছুই নেই। কৃষ্ণই তো কলির জীবের আকাশ। চন্দ্রাতপ। কৃষ্ণতেই সব কিছু মেশাতে হবে। বলতে হ'বে আমার যা সবই তোমার। আমি নিঃস্ব, আমি অসহায়। তোমার বলই আমার বল। তুমি রেখেছো তাই আছি। আমার

রত্ন-ঐশ্বর্য তুমি, আমার মন-প্রাণ সবই তোমার দখলে। হৃদয়ের পতিত জমিতে ভক্তির বীজ বপন করো, হে পতিত-পাবন। হে দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু, সেই কণ্ঠ আমাকে দাও যেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমার নাম উচ্চৈঃস্বরে করতে পারি। সেই চোখ আমাকে দাও যে চোখ দিয়ে তোমার বিশ্বরূপ আমি দর্শন করতে পারি। সেই কান আমাকে দাও যা দিয়ে তোমার ডাক আমি শুনতে পারি। সেই মন আমাকে দাও যে মন দিয়ে তোমার মন জয় করতে পারি। সেই প্রাণ আমাকে দাও যে প্রাণ আমি তোমার পাদপদ্মে রাখতে পারি। তোমাকে যেমন আমি চাই তেমনি তুমিও আমাকে চাও।'

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে
গুরু অন্তর্য্যামী রূপে শিখায় আপনে।"

কৃষ্ণকে খুশী করো। সে সুখী হতে না পারলে তোমার ভব-অসুখ সারবে না। কৃষ্ণকে সুখী করতে গেলে কোন মন্ত্রের প্রয়োজন নেই। কোন কৃচ্ছ্র সাধনেরও দরকার নেই। কৃষ্ণ অতি সহজ লভ্য—শুধু মিশে যেতে হ'বে মাটিতে। তোমার সকল অহংকার, তোমার সকল পাণ্ডিত্য, তোমার সকল অভিমান ঝেড়ে ফেলতে হ'বে।

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবে করিবে।
ভৎ´সনে তাড়নে কারে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না ভোলয়।
শুকাইয়া মেলে তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত তৃপ্তি কিম্বা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লইব যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই তো আবার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥"

ব্যাসপূজা শেষ হবার পরও নিত্যানন্দ শ্রীব্যাসের বাড়ীতেই থাকে। শ্রীব্যাসের স্ত্রী মালিনীও যেন তাকে ছাড়তে চায় না। এমন রত্ন কেউ কি ছাড়তে চায়?

নিতাই মালিনীকে 'মা' বোলে ডাকে। আবদার করে। বাড়ী ঘরময় ছুটাছুটি করে। কখনও মালিনীর কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বলে ওঠে—দে মা খেতে দে, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

মালিনী তাকে আদর করে কাছে বসিয়ে ভাত মেখে খাইয়ে দেয়।

নিতাই খায় আর বলে—তোর নাম কে মালিনী রেখেছিল? সে যেন এক সরল শিশু। কাদামাখা মন যেন!

মালিনী—কেনরে, নাম রেখেছিল আমার বাপ-মা।

—তোর বাবা বুঝি ফুলবাগানের মালী ছিল?

—দূর বোকা ছেলে, তা হোতে যাবে কেন! বাবা খুব মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন।

নিতাই হেসে বলে—হুঃ, ঐ তাল গাছটার মত।

মালিনী বলে—নে খাচ্ছিস খেয়ে নে, অত শত কথায় তোর কি দরকার।

নিতাই লাফ দিয়ে উঠে পড়লো—খাবো না, তোর ভাত খাবো না। নবদ্বীপে আবার আমার ভাতের অভাব!

মালিনী অবাক হয়ে যায়—তোকে আবার কি বললাম কখন, আয় বাবা, খেয়ে নে—

—না, না, না, তোদের ভাত আমি খাবো না!

মালিনী করুণ সুরে বলে ওঠে—হ্যাঁরে তাহলে কি খাবি?

—কেন রাধাবল্লভকে ভোগ দেবে না? তাই খাবো—আমি না খেলে নবদ্বীপে কোন দেবতার ভোগ হবে না।

মালিনী প্রমাদ গোণে—বলে কি ও, কি জানি হয়তো তাই হ'বে।

পরে আদর করে ডাকে—আয় বাবা। মাখন আছে। ক্ষীর আছে।

নিত্যানন্দ যেন বালক।

সেই বালকসুলভ চপলতা নিয়েই আবার এসে মালিনীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

খেতে খেতে বললে—মা, তুই মালিনীই ঠিক। ফুলবাগান তুই শুধু চৌকিই দিসনে। তুই চৌকি দিস তাকে যে সৃষ্টি করেছে। তোর চোখ ফাঁকি দিয়ে তাই তো সে পালাতে পারে না।

—এ সব কি বলছিস!

—হ্যাঁরে, তুই মালিনীই বটে—

নিতাই ছুট দেয় নিমাইয়ের বাড়ী।

নিমাই আর বিষ্ণুপ্রিয়া পাশাপাশি বসে আছে। এ বেশ এর আগেও তিন যুগে দেখেছে। এ তার কাছে নূতন নয়।

—এসো দাদা!

নিমাই নিতাইকে হাত ধরে পাশে নিয়ে বসালো।

দুজন দেখছে দুজনকে—

নিমাই হঠাৎ বললে—তোমাকে আমার বড্ড সাজাতে ইচ্ছে কোরছে—

নিতাই হেসে বলে—বেশ তো সেজেছি, আবার কেন! এক একবার এসে এক এক সাজ পরাচ্ছো, তোমার কি সাজানোর সখ মিটছে না?

—না দাদা, আমাকে বাধা দিও না। এমন যার কৃষ্ণভক্তি তাকে সাজালে কেমন দেখায় তাই একটু দুচোখ ভরে দেখবো!

নিমাই নিতাইকে সাজায়।

মাথায় দেয় ফুলের মুকুট। সারা অংগে লেপে দেয় সুগন্ধী চন্দন। চোখে কাজল মাখায়। কপালে দেয় চন্দনের টিপ। হাতে ফুলের বালা পরায়। গায়ে দেয় নীল রঙের উত্তরীয়!

ভক্তদের নির্দেশ দেয় কীর্তন করতে।

খোল করতাল বেজে ওঠে—শুরু হয়ে যায় নৃত্যগীত।

নিত্যানন্দ মাঝে আর পাশে সবাই। নিতাই দুবাহু তুলে নাচতে শুরু করে। কখনও হাসে। কখনও কাঁদে আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে হুংকার দেয়।

নিমাই বসে বসে দেখে নিত্যানন্দর রাজবেশ।

যেমন ভক্ত তেমন ভগবান।

আর ভাগ্যবান তারা। যারা দেখে।

নিতাইয়ের গলায় মালা দোল খাচ্ছে। কি অপরূপ ভাব।

কি অপরূপ আবেগ; এই না হলে নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ নিত্যানন্দই—

এমন না হলে কেউ অপরকে আনন্দদিতে পারে? এমন না হলে কেউ অপরকে কাঁদাতে পারে!

নামগানে ভাসছে নবদ্বীপ।

হাবুডুবু খাচ্চে নদীয়ার মানুষ। পথের বন্যায় এবার নবদ্বীপ ডুবে যাবে। নিত্যানন্দ এনেছে জোয়ার। নিতাই এনেছে ঢেউ, নিতাই এনেছে সব কূল ভাসানো স্রোত, সব ভেসে যাবে।

"নামে নিত্যানন্দ, তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যনন্দ রাগ মূর্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ পর্য্যটন ভোলে ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসত্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা।"

যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই নিত্যানন্দ।

কৃষ্ণ ছাড়া নিত্যানন্দ নেই। কৃষ্ণ মানেই তো নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ মানেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে পেতে হলে আগে নিতাইয়ের

আশ্রিত হতে হ'বে! কৃষ্ণকে সার করতে হলে আগে নিতাইয়ের দ্বারী হতে হ'বে!

"নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিও কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই,
সখী, সখা, শয়ন স্বপন বন্ধু ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব জনকরক্ষক সর্ব্ব মিত্র॥
ইহান ব্যবহার সর্ব্বকৃষ্ণরসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি হয়॥"

নিমাই বলে—নিত্যানন্দকে ভক্তিভজনা করা মানে কৃষ্ণকেই ভক্তিভজনা করা। যে সে, সেই আমি—দুইই এক। তোমরা নাম করো। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাও। ঘরে ঘরে নাম পৌঁছে দাও। পশুপক্ষীকে কাঁদাও। এ ছাড়া কলিতে আর দ্বিতীয় পথ নেই। নামই পথ। নামই পূর্ণ করবে মনোরথ।

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল করো কৃষ্ণ শিক্ষা॥

নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে ছুটলো নিত্যানন্দ হরিদাস।

নাম নাও। একবার কৃষ্ণ বলো। কত জনের জন্যেই তো জীবন ভোর কাঁদলে। ছেলের জন্য কাঁদলে। মায়ের জন্য কাঁদলে। স্ত্রীর জন্য কত কাঁদলে। কি পেলে? কিছুই তো পেলে না, শুধু কান্নাই সার হোল। এবার কৃষ্ণের জন্য কাঁদো। কৃষ্ণ বলে আকুল হয়ে কাঁদো। শুধু একবার কাঁদো—চোখের জলে তাঁর পা ধুইয়ে দাও। তিনি ঠিক তোমাকে কৃপা করবেন। কৃপাসিন্ধু তিনি—নামে কোন ভেদ নেই। এতে সকলের সমান অধিকার।

তুমি নীচ, তুমি অশুচি, তুমি পতিত, তুমি অদৃশ্য! নাম নাও। নাম করো। তুমিই তার হোয়ে যাবে! যে আগে তোমাকে ছুঁলে গংগাস্নান কোরে পবিত্র হোত—এবার তোমার স্পর্শেই তার কাছে গংগাস্নানের সমান হ'বে।

নবদ্বীপে এবার এক নতুন সূর্য উঠেছে।

এ আলো সব জায়গায় সমান ভাবেই পড়বে।

শুধু একবার বলো—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ।
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে!
যে জন শ্রীগৌরাঙ্গ ভজে
সে হয় আমার প্রাণ রে!!"

## ॥ ষষ্ঠ ॥

নবদ্বীপের নাম করা মাতাল জগাই মাধাই।

এমন পাপ কাজ নেই যা তাদের দ্বারা হয় না। পাড়ার মেয়েরা তাদের দুজনার ভয়ে রাস্তায় বের হতে পারে না। দিন-রাত শুধু মদ খায় আর গুণ্ডামী শয়তানী করে বেড়ায়। কাজীর কাছে কেউ নালিস করতে সাহস পায় না, কি জানি যদি শেষে তার বিপদ হয়।

বৈষ্ণবে তাদের বড় আক্রোশ। টিকিওয়ালা কাউকে দেখলেই তারা তার পিছু নেয়। কাউকে বলে—ইস্! টিকি-মালা-তিলক পরে শালারা সাধু হয়েছে! মদ মাংস যে ধর্মে খাওয়া নিষেধ সেটা আবার ধর্ম নাকি।

জগাই বলে—দেখ্ মেধো, শালার টিকিওয়ালা দেখবি আর ধরে নিয়ে আসবি। শালাদের মাংস খাইয়ে দেবো। না খেয়ে শুকিয়ে মরে কি সাধনা হয়—

মাধাই বলে—জগন্নাথ মিশ্রের বেটা নাকি অবতার হয়েছে।

—অবতার, সেটা আবার কি রে?

—তুই মাতালই বটে। অবতার বুঝিস নে—ওর নাকি রাতের বেলায় আর দুখানা হাত গজায়। ওর হাতে নাকি চক্র ঘোরে! বেটার ভণ্ডামী আমি দেবো ঘুচিয়ে।

জগাই চীৎকার করে ওঠে—ও বেটাকে একদিন আনতে পারিস। দেখবো কেমন অবতার। ওর সংগে আবার একটা ফেউ জুটেছে নিত্যানন্দ না কি! ও বেটা আবার কথায় কথায় কাঁদে।

মাধাই এবার হাসে।

ও শালার ঠিক মৃগী ব্যারাম আছে।

দুজনে মদ খায় আর আপন মনে বলে—নবদ্বীপে ওসব চলবে না। ওসব গান চলবে না। রসের গান গাইতে হবে—যে গান শুনলে সব শালা ভুল হয়ে যায়?

—ঠিক বলেছিস মেধো। শালা দুনিয়ায় এসেছি। খাবো-দাবো ফুর্তি করবো। ·গট করে একদিন মরে যাবো।

জগাই এবার কান্না শুরু করে দিল।

মাধাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে—ও কিরে, কাঁদিস কেন?

—তুই মরার কথা বললি কেন। মরলে যে আর মদ খেতে পাবো না।

দূর বোকা, ভূত হয়ে মদ খাবো।

হঠাৎ জগাই বলে—দেখতো, দূরে কে আসছে না? শালাদের কেউ একজন হবে রে।

মাধাই দূরে তাকিয়ে বলে—তাইতো, মনে হচ্ছে সেই ফেউটা! আসুক শালা, আজ ওর গায়ে ঠিক বমি করে দেবো। নে, একটু আড়ালে চল।

নিত্যানন্দ ভাবে বিভোর হয়ে হেলে-দুলে আসছেন পথ বেয়ে। মনে হচ্ছে একটা ভাবের নৌকা পথ বেয়ে ভাসতে ভাসতে আসছে। পিছনে হরিদাস, আরও কয়েকজন।

পথে বাধা দেয় কয়েকজন। বলে—এ পাগলামী ছাড়ুন আপনারা। মদের গন্ধে সেখানে কেউ যেতে পারে না, আর আপনারা চলেছেন মাতালকে কৃষ্ণ কথা শোনাতে—ফিরে যান।

নিত্যানন্দর কণ্ঠ তখন আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে।

"বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।"
"পাতকী তরিতে প্রভু হৈলা অবতার
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর।"

জগাই মাধাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি হতেই ওরা দুই ভাই তাড়া করলো।

নিতাই আর হরিদাস ছুট দেয়।

জগাই মাধাই তাদের পিছন পিছন তাড়া করে।

কৃষ্ণ, ওদের তুমি রক্ষা করো। ওদের পাপ মুখে কৃষ্ণ নাম দাও। ওদের উদ্ধার করো! তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক করো।

নিমাই বলেন—পাপ দিয়ে মোড়া ওদের দেহ। এত তাড়াতাড়ি কি ওরা বশে আসবে—তবে নিত্যানন্দ, তুমি পারবে। ওদের মঙ্গলই যখন তোমার মঙ্গল তখন ওরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ নাম করবে। কৃষ্ণ নাম ওদের নিতেই হবে। পাপকাল ওদের পূর্ণ হয়ে গেছে।

নিমাইয়ের চোখে হঠাৎ জল এলো।

চোখের জলে বুক ভেসে যায়, বলেন—ওদের তোমরা কেউ ঘৃণা করো না। ওরা পাপ করছে তা যদি জানতো তাহলে কি আর করতো। এর জন্য ওরা দায়ী নয়। ওদের পূর্বজন্মের কর্মফলই এর জন্য দায়ী। ঘৃণা করে ওদের দূরে সরিয়ে রেখো না। তোমরা আবার যাও। কৃষ্ণ নাম ওদের মনে এসে গেছে, এবার তোমরা ওদের কণ্ঠ দিয়ে তা প্রকাশ করাও।

নিত্যানন্দ দলবল নিয়ে কীর্তন করতে করতে আবার চললেন জগাই মাধাইয়ের বাড়ি।

তখন পড়ন্ত বেলা। সূর্য অস্ত যায় যায়।

জগাই মাধাই সারা দুপুর মদ খেয়ে ঘুমিয়েছিল। ঘুমের ঘোরেই কীর্তনের শব্দ ওদের কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসলো।

মাধাই বিকট চীৎকার কোরে উঠলো—শালাদের আজ এক-একটা করে কচু কাটা করবো। মাল খেয়ে সবে একটু ঘুমিয়েছি, শালারা আমার নেশা ভেঙে দিল।

মাধাই উঠে বাইরে এসে দাঁড়াল।

জগাই বলে—চল, ভিতরে যাই। ওরা আমাদের না দেখতে পেলেই চলে যাবে।

মাধাই বেঁকে বসলো—কি, আমরা কাজীর খাজনা দিইনে যে ভয়ে পালিয়ে যাবো।

একটু থেমে মাধাই বলে—কি গান গাচ্ছেরে। বেহুলার ভাসান, তাই না?

—কি জানি ওসব কি আর বুঝি!

মাধাই বলে—বেকুব আর কাকে বলে—

—কেন?

—বলি কেন নয় রে! অমন জোয়ান মেয়ে বেহুলাকে শালারা মরা স্বামীর সাথে নদীতে ভাসিয়ে দিল। আমি হলে ওকে ঘরে নিয়ে আসতাম। বিয়ে করতাম।

ওরা সবাই কীর্তন করতে করতে এসে ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে নাম করতে শুরু করে।

মাধাই বলে—কে চেঁচায়?

নিত্যানন্দ বলে ওঠেন—আমি গো, নিত্যানন্দ।

—ওরে শালা। আবার তুমি এসেছো। এবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার মজা।

এই বলে মাধাই একটা ভাঙা কলসীর টুকরো ছুঁড়ে মারলো নিতাইয়ের কপালে। কপাল ফেটে দরদর কোরে রক্ত পড়ে।

নিত্যানন্দ বলেন—আমাকে তোমরা আরও মারো, শুধু একবার কৃষ্ণ নাম করো, শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো, আর খণ্ড খণ্ড করে আমাকে মারো। বল ভাই—

বটেরে বেটা!

এই বলে আর এক টুকরো ভাঙা কলসী তুলতে যাবে, এমন সময় জগাই হাত ধরে ফেলে বলে—মেধো, তুই কি পাগল হলি? ওকে মেরে কি হবে, ও তো একটা সামান্য মানুষ।

—তবে নিয়ে আয় ওর পাণ্ডাকে, সেই ব্যাটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

বেশ, তাই হবে, ওদের পাণ্ডাকেই ধরে আনবো।

নিত্যানন্দ কাঁদতে কাঁদতে বলেন—ভাই, আমাকে তোমরা শেষ করে ফেলো! তোমাদের কানে যখন কৃষ্ণ নামই দিতে পারলাম না, তখন এ জীবন আর আমি রাখবো না। ভাই জগাই, তুমি মাধাইকে বল আমাকে শেষ করুক।

নিত্যানন্দের চোখের জলের ধারা যেন আর বাধা মানছে না। জগতের কোটি কোটি জীব যে নামে কাঁদে, সেই নাম এদের দিতে পারলেন না।

সংবাদ চলে গেলো নিমায়ের কাছে, যে নিত্যানন্দর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে পাষণ্ডেরা।

নিমাই চঞ্চল হয়ে ছুটে গেলেন।

নিত্যানন্দ তখনও কাতর অনুনয় করছেন,—ভাই, আমি মরি তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু একবার কৃষ্ণ বলো। তোমাদের মুখে একবার কৃষ্ণ নাম শুনে এ তুচ্ছ দেহ আমি শেষ করতে চাই।

নিমাই সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেন।

চক্র ছুটে চলে জগাই মাধাইয়ের দিকে।

নিতাই বললেন,—এদের বধ করলে এরা তো উদ্ধার হবে না। এ দুটো প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দাও। তাছাড়া জগাই তো আমাকে আজ বাঁচিয়েছে।

নিমাই অবাক হয়ে বলেন,—বলো কি!

নিমাই জগাইকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন,—তুই আমার নিতাইকে রক্ষা করেছিস। আমি তোর কেনা হয়ে রইলাম। তুই আমাকে ঋণী করে রাখলি।

জগাই তাঁর পায়ের ওপর পড়ে গড়াগড়ি খায়।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখে নিমাই নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ।

মাধাইয়ের নেশা একেবারেই ছুটে গেছে।

সে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে আর বলে,—প্রভু, আমার চোখের সামনে জগাই উদ্ধার হয়ে গেল আর আমি পড়ে রইলাম। জীবনে যে পাপ আমি করেছি সে তো আমি করিনি, তুমিই তো সে পাপ আমায় দিয়ে করিয়েছ। তবে আমি কেন দোষী হ'ব প্রভু! এবার তোমার কাছে ন্যায্য বিচার চাই। হে কৃষ্ণ করুণারসিন্ধু, মাতাল আমি ছিলাম বটে, কিন্তু আমাকে তো তুমিই মাতাল করেছিলে —তোমাকে ভুলবো বলেই তো মাতাল করেছিলে। তবুও আমি মহাপাপী! আমাকে তুমি বধই করো—

মাধাই নিমাইয়ের গা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

নিমাই মাধাইকে হাত ধরে টেনে তুলে বুকের মধ্যে আকড়ে ধরে বলেন,—আর তোমার কোন পাপ রইল না। কিন্তু নিত্যানন্দর গায় যে হাত দিয়েছে তাকে ক্ষমা করার শক্তি আমার নেই। সেই পারে তোমাকে ক্ষমা করতে।

মাধাই এবার নিত্যানন্দর পা ধরে।

নিমাই বলেন,—তুমি ওকে ক্ষমা করো।

নিত্যানন্দ নিমাইয়ের দিকে চেয়ে বলেন,—তুমিই তো ওকে আগে ক্ষমা করেছ, তা না হলে ওকে ক্ষমা করার শক্তি আমি পেলাম কোথায়? দয়া করবে তুমি, কৃপা করবে তুমি। আমি কে? এ যাত্রায় দুনিয়ায় আসা তোমার তো এই জন্যই। যেখানে যত পাপী তাপী আছে সব এবার উদ্ধার পাবে।

"নিত্যানন্দ বলে প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষদ্বারে কৃপা করো সেই শক্তি তুঞি।
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিঁলু মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥

তোর যত অপরাধ—কিছু দয়া নাই।
মায়া ছাড়ো কৃপা করো, তোমার মাধাই।"

নিমাই বলেন—ভাই মাধাই, তোমার যত পাপ সে সব তো আমার। তোমার ভিতর থেকেই তো আমি করিয়েছি। আজ বড় পুণ্যদিন—জগাই মাধাই কৃষ্ণপ্রেম পেলো। এ লগ্ন বিফলে যেতে দেওয়া হবে না। নাম করো।

সবাই কীর্তন শুরু করলো—

নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিনু মুখে, মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহংকারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাশরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দু'খানি॥
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙা চরণের পাশ॥

কীর্তন শেষে মাধাই নিতাইকে বলে করযোড়ে—প্রভু, আমার কি গতি হ'বে। যে দেহে স্বয়ং কৃষ্ণ বাস করেন সেই দেহে আমি আঘাত করেছি। কোন্ নরকে আমার যায়গা হ'বে?

নিতাই বলেন—মাধাইরে, আমাকে মারলে বলেই তো তুমি বাঁচলে। তুমি উদ্ধার হলে বলেই তো প্রভুর মহিমা ছড়ালো। এ জগৎ যতদিন থাকবে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য উঠবে ততদিন মানুষ তোমাদের ভুলবে না। তোমাদের দুভাইয়ের কথা লোকের মুখে মুখে চলবে। এইটুকু মনে রেখো, কৃষ্ণকৃপাই সব পাওয়া। এর ওপর মানুষের চাইবার আর কিছুই নেই। মানুষ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সবই একদিন হারাবে, কিন্তু কৃষ্ণকৃপা যে একবার পাবে সে আর হারাবে না কোনদিন। কৃষ্ণপ্রেমের এই তো গুণ। তোমাদের দেহে যখন কৃষ্ণপ্রেমের বীজ বপন হলো, এবার তাকে বিরাট মহীরুহে পরিণত করো। দুনিয়ার সব মানুষকে সেই কৃষ্ণপ্রেমচ্ছায় আশ্রয় দাও।

"আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ মাত্র ॥
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥
যে জন চৈতন্য ভজে সেই মোর প্রাণ,
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥
না ভজি চৈতন্য যবে, মোরে ভজে পায়,
মোর দুঃখে সে হো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥"

মাধাইয়ের চোখে জল ঝরছে।

যত শোনে ততই জল ঝরে। যেন মেঘে মেঘে জলের খেলা। কৃষ্ণনাম আজ মেঘ হয়ে মাধাইয়ের অন্তরে প্রবেশ করছে। গুরু গুরু মেঘ ডাকে হৃদয়ে। ঝুরু ঝুরু জল ঝরে।

মাধাই নিতাইয়ের সঙ্গ ছাড়ে না।

কেঁদে কেঁদে বলে—প্রভু, আমি মহাপাপী—আমার উপায় বলুন।

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপ অপি ধর্মায় কল্পতে।
মামনা দৃত্য ধর্মোপি পাপং শ্যাম্য প্রভাবত ॥

[ পদ্মপুরাণ ]

"পদ্মপুরাণেতে কৃষ্ণ কহেন আপনে।
ইহা জানি আচরণ কর সর্বজনে ॥
আমার নিমিত্তে যদি করে পাপ কর্ম।
পাপ কল্পনা তার হয় মহাধর্ম ॥
মোরে অনাদর করি যদি করে ধর্ম।
আমার ইচ্ছায় সেই হয় পাপকর্ম ॥"

'যারে কৃপালেশ হয় প্রভু নারায়ণ।
কিসের অভাব তার এ নিত্যভুবন ॥
কিঞ্চিৎ প্রসন্ন যদি হয় হৃষীকেশ।
তার সেই মৈত্র হয় জানিবে বিশেষ ॥
বিষভার পথ্য হয় অধর্মতে ধর্ম।
বিপরীতে বিপর্যয় অকর্মতে কর্ম ॥"

॥ সপ্তম ॥

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়।

নদীয়া ভাসছে নামগানে। প্রেমের ঠাকুর এবার অবতীর্ণ হয়েছে নদীয়ায়। জগাই মাধাইয়ের মত পাষণ্ড সেও উদ্ধার হয়ে গেল। বোতলের মদ ছেড়ে এবার কৃষ্ণপ্রেমের-মদ পান করছে। মাতাল এখন পুরোমাত্রায়। কৃষ্ণপ্রেমের মাতাল যারা তারা মাতালের মাতাল। মদের মাতাল নেশার ঘোরে মাতাল হলে আবোল তাবোল বলে আর কৃষ্ণপ্রেমের নেশায় যারা মাতাল হয় তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।

নামের বন্যা বয়ে চলেছে সারা নদীয়ায়। নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুর। শান্তিপুর থেকে ফুলিয়া। আখড়ায় আখড়ায় গান। পাড়ায় পাড়ায় গান, সর্বত্র শুধু গান আর গান। যেখানে কীর্তন সেখানেই নিমাই-নিতাই।

একি ভুবন ভোলানো নাম নিতাই-নিমাই এনেছে, যার আর তুলনা হয় না।

নিতাই একদিন গংগাস্নান করছেন। আরও ভক্ত আছেন সেখানে। সবাই একবার করে ডুব দেয়, আর হরি হরি বলে। হঠাৎ নিত্যানন্দর কানে গানের সুর ভেসে আসে—

"ওরে মন! বুঝিয়া বুঝিতে নার।
সেখানে কি কথা, কহিয়া আইলি
এখানে কি কাজ করো।
কি সুখে ভুলিছ, পাছু না গণিছ
শমন দেখ না পাছে।
কখন লইবা, কেহ না জানিবা
শতেক থাকিলে কাছে।

যত পরিজন, যতনে পালিছ
মাথায় বহিয়া ভারা।
দিবস রজনী, ভাবিতে গণিতে
আপনি হইলি সারা॥
চুরি প্রবঞ্চনা, কত না করিছ
যাদের স্থখের লাগি।
যখন এ পাপে, নরকে ডুবাবে
তখন কে তোর ভাগী॥
কোথা হইতে আইসে
কোথা কেবা যায়,
দেখ না কে করে সাথী।
কিসে সে আপন, হইল কখন
তোমার আমার তাথি।
বদন ভরিয়া হরি হরি বল,
এ তিন লোকের বন্ধু।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রভাবে
তরিবে এ ভবসিন্ধু॥

নিত্যানন্দ ভাবাবেশে জলের ভিতর জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যান। সবাই এসে ধরে তোলে। যখন জ্ঞান হয় তখন নিত্যানন্দ বলেন—অমন মধুর কণ্ঠে গান কে গাইছিল?

একজন বললে—নৌকার মাঝি।

—কতদূর গেল।

—ঐ যে দূরে নৌকা চলেছে, ঐ নৌকার মাঝি।

নিত্যানন্দ গংগার ধার দিয়ে ছুট দিলেন।

সবাই তাঁকে ধরতে যায় কিন্তু ধরতে পারে না। নিত্যানন্দ সমানে ছুটে চলেছেন। আর চীৎকার করে ডাকছেন—মাঝি, একটু

দাঁড়াও। নিত্যানন্দর চীৎকার মাঝির কানে যেতেই মাঝি নৌকা ঘুরিয়ে তীরে নিয়ে এলো।

নৌকা একটা ঘাটে লাগিয়ে মাঝি নেমে এসে বললে—কেডা গো, অমন করে ডাকতিছ?

নিত্যানন্দ হাত ইসারা করে ডাকছেন—কই, এসো।

মাঝি কাছে আসতেই নিত্যানন্দ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—এমন গান তুমি কোথায় শিখলে? ওগো, তুমি আমাকে একটু কৃপা করো। আমাকে একটু কৃষ্ণপ্রেম শেখাও।

মাঝি লজ্জায় মাথা নীচু করে বললে—হেই ঠাকুর, এসব কথা কি কও, আমি মহাপাপী।

নিতাই যত কাঁদেন মাঝিও তত কাঁদে।

দুজনের চোখের জলে সেই মধুর মুহূর্তটা যেন রসসিক্ত হয়।

॥ অষ্টম ॥

তারপর একদিন বিনামেঘে যেন বজ্রাঘাত হয়। একদিন কীর্তন শেষে নিমাই ভক্তবৃন্দ পরিবেশে বলেন,—আমি সন্ন্যাস নেবো।

সকলে যেন চমকে যায়।

যাকে ঘিরে সবকিছু। যার জন্যে সারা নবদ্বীপ আলো হয়ে রয়েছে সেই আলো নিভে যাবে অন্ধকারের আঁচলের তলায়।

নিমাই আর আসবেন না।

ঐ অপরূপ রূপসৌন্দর্যমধু আর কেউ পান করতে পারবে না। এ জ্বালা কি সহ্য করা যায়।

সবার চোখে জল।

নিত্যানন্দ বলেন,—তোমার মার কি হ'বে, বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হ'বে?

নিমাই জবাব দেন,—মায়ের অনুমতি নেবো।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া—

নিমাই হাসেন,—তিনযুগে সে আমার বিরহ সহ্য করেছে, এ যুগেও পারবে। তাছাড়া আমি তো তাকে ছাড়া কখনও নেই।

নিমাই তাকান সবার দিকে,—আমি যেখানেই যাই তোমাদের ছাড়া কখনই হবোনা। যখনই নাম সংকীর্তন করবে তখনই আমি তার মাঝে থাকবো। আমার এ দেহ তোমাদের মাঝেই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। আমি তোমাদের ছাড়া নই, তোমরাও আমি ছাড়া নয়। তোমরা নাম করো। নাম বিলাও, কলির জীবের জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল, তাদের কানে নাম দিয়ে তাদের মনস্কাম পূর্ণ করো। একটু থেমে নিমাই বলেন,—আমার জন্য তোমরা কেউ দুঃখ করোনা, শুধু নাম করো।

"নদীয়া বিনোদিয়া
জয় নিতাই রঙ্গিয়া

এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ শ্রীহরি হে
আমি আর কিছু চাহি না।
ওহে প্রানের গৌরহরি আর যেন ভুলায়োনা।
এ সংসারে মায়ার খেলনা দিয়ে
অনেকদিন তো খেলেছি হে।
গৌর তোমার ভুলে এই পুতুল খেলা
আর যেন ভুলায়োনা।
এই কৃপা করো মোদের গৌরাঙ্গ শ্রীহরি হে,
প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় না পাশরি।
আমাদের প্রভু পতিতের বন্ধু নিতাই
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা,
এই ক'রো জন্মে জন্মে যেন ভৃত্য হই তথা।"

নিমাই কাঁদছেন। শুধু কাঁদছেন—

এত কান্না কেউ তাঁকে কাঁদতে দেখেনি।

নিমাই বলেন,—জীবনভোর তো কতই কাঁদলে। এবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদো। কাঁদতে যদি হয় তাঁর জন্যই কাঁদো, চোখের জল তোমার ব্যর্থ হবে না। শান্তি পাবে, শোক-তাপ ভুলতে পারবে। সবকিছু ভুলতে শ্রীকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় নিতে হ'বে। এ আশ্রয়ের মত বড় আশ্রয়, এ আশ্রয়ের মত নিরাপদ আশ্রয় আর নেই।

## ॥ নবম ॥

১৪৩৬ সালের মাঘের শেষভাগে শেষরাত্রে নিমাই গৃহত্যাগ করেন।

'কই কৃষ্ণ' 'কোথা কৃষ্ণ' বোলতে বোলতে নিমাই চলেছেন আগে আগে—নিত্যানন্দ পিছন পিছন ছায়ার মতন চলেছেন।

নিত্যানন্দকে দেখে বললেন,—বল কোথায় যমুনা। এক একবার ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যাবার মতন হন।

নিত্যানন্দ গংগাকে দেখিয়ে বলেন—এইতো যমুনা, চল আমরা ওপারে যাই।

—তাই চল।

নিত্যানন্দ তাঁকে নিয়ে চলে এলেন অদ্বৈতাচার্যের বাড়ী শান্তিপুরে। এই সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিত শচীদেবীকে নিয়ে আসেন। তিনদিন সেখানে থাকেন।

অদ্বৈতাচার্য মহাখুশী।

স্বয়ং প্রেমের অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আজ তাঁর ঘরে।

অদ্বৈতাচার্য বলেন,—প্রভু, আমি আজ স্বহস্তে রন্ধন করে তোমাকে খাওয়াবো। আমাকে দয়া করো।

নিমাই তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

অদ্বৈতাচার্য বলেন,—যে যত অধিক অধম সে তত সর্বপ্রধান দয়ালের কৃপাপাত্র। তোমা হইতে বড় দয়াল কেহ নেই। আমা অপেক্ষা অধিক অধমও জগতে কেহ নেই। অতএব আমাকে দয়া না করলে জগতে তোমার পরম দয়ার দ্বারা উদ্ধারের পাত্র লাভ দুঃসাধ্য হবে। নিমাই বলেন—তোমার অন্ন আজ যে আমার কাছে অমৃত। আমি নিশ্চয়ই খাবো।

"প্রভু বলে যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি সেই পায় সর্বনায়॥
তুমি যে নৈবদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার হয় মন॥

শান্তিপুর থেকে সোজা নীলাচলে গমন করলেন। নিমাই নিত্যানন্দকে বার বার ফিরে যেতে বললেন, কিন্তু নিত্যানন্দ সংগ ছাড়লেন না। পথ চলতে চলতে নিমাইয়ের দণ্ড নিত্যানন্দ ভেঙে ফেললেন। নিমাই বললেন কাতর অনুনয় করে—নিত্যানন্দ, তুমি ফিরে যাও। নিত্যানন্দ ছাড়বার পাত্র নয়।

একাকী নিমাইকে ছেড়ে দিতে তাঁর মন চায় না। পথ চলতে চলতে নিমাই যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে মূর্চ্ছা যান তাহলে কে তাঁকে দেখবে। যদি কখনও পথশ্রান্ত হয়ে পড়েন তাহলে কে তাঁর পরিচর্যা করবে!

"নিত্যানন্দ প্রভু কহে—ঐ হে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥
এক দুয়ে সংগে চলুক না পড় হটরঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সংগে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥

"প্রভু কহে আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা যাইলে অদ্বৈত ভবন॥
নীলাচলে আসিতে মনে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহ আমার কার্য্য ভণ্ড॥"

নিত্যানন্দ বললেন এবার—প্রভু, তুমি বোধ হয় ভাবছো তোমার সঙ্গে আমরা গেলে আমাদের কষ্ট হ'বে। কিন্তু সাথে না নিলে আমরা যে তোমার বিরহ ও দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় হব সেকথা তো চিন্তা করছ না। যা হোক তাহার দুঃখকষ্ট ভোগ অপেক্ষা তোমার আজ্ঞা পালনই শ্রেষ্ঠ। তোমার কথার বিরুদ্ধে আমি যাব না।

পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু বাসুদেব সার্বভৌম নিমাইয়ের সঙ্গলোভে নীলাচলে নিমাইয়ের সংগে মিলিত হন। তিনি বললেন—

বহু জন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমা সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ি যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি। তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—বাংলায় ফিরে গিয়ে সংসার ধর্ম্ম করো। সংসারে থেকেও কৃষ্ণলাভ হয়। কলির জীবের উদ্ধারের ভার তোমার ওপর রইল। নাম দিয়ে তাদের জয় করো—কৃষ্ণপ্রেম তোমার সহায় হোক।

নিমাইয়ের চোখে জলের ধারা—

নিত্যানন্দ কাঁদেন, সার্বভৌমের চোখে জল।

নিমাই বললেন—আমি চললাম নীলাচলে, সেখান থেকে বৃন্দাবন যাব ঝাড়খণ্ডের পথে।

প্রেমের ঠাকুর নিমাই চলেছেন নীলাচলের পথে, মুখে তাঁর কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং।
রাম রাঘব। রাম রাঘব। রাম রাঘব। রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব। কৃষ্ণ কেশব। কৃষ্ণ কেশব। ত্রাহি মাং॥”

## ॥ দশম ॥

নিত্যানন্দ আজ্ঞাবহ। যে আজ্ঞা দিয়ে গেছেন মহাপ্রভু তা তাঁকে পালন করতেই হবে। নিত্যানন্দ শুধু মনে মনে ভাবেন—এত বড় কঠিন আদেশ তাঁকে না দিয়ে তো তিনিও পালন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে তাঁকেই বা এ আদেশ দিলেন কেন? নিমাই যদি গৃহ ত্যাগ না করে সংসারধর্ম পালন করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের ধর্মের এত ব্যাপক প্রচার হোত না। শচীদেবী কাঁদবেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদবে আর সেই দেখাদেখি সবাই কাঁদবে—এ না হলে তো তাঁর মহিমা প্রকাশ হয় না। সবাই না কাঁদলে তো প্রেমময় কৃষ্ণ চঞ্চল হবে না।

নিত্যানন্দ বাংলার পথে ঘুরতে ঘুরতে দাক্ষিণাত্যে এলেন। এখানে এসে শংকরারণ্যের সাথে দেখা হল। তিনি যেন তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন।

শংকরারণ্য বললেন—এত দেরী করতে হয়, আমি যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।

—কেন!

—বারে! তোমার সাথে যে আমি যাবো।

—কোথায় যাবেন?

—তুমি যেখানে যাবে, সেইখানেই আমি যাব। সব কাজ আমি শেষ করে বসে আছি শুধু এই একটা কাজের জন্য।

—বেশ, তাই চলুন!

শংকরারণ্য দেহ ত্যাগ করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মা নিত্যানন্দের দেহে প্রবেশ করল।

নিত্যানন্দ চমকে উঠলেন একবার।

মহাপ্রভু গেছেন নীলাচলের পথে।

নিত্যানন্দ ফিরছেন বাংলায়। বাংলার কোমল মাটিতে নাম-সংকীর্তনের চাষ করতে হবে। নামের ফসল তুলে ভাবের গোলায় রাখতে হবে। এ যুগে এবার এই নাকি একমাত্র পথ। এ পথ ছাড়া আর উপায় নেই।

"সেই যুগে যেই ধর্ম করহ ভজন।
কলিযুগে সংকীর্ত্তন শাস্ত্রের বচন॥
সত্যযুগে বিষ্ণুপাদপদ্ম করে ধ্যান।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্ম শাস্ত্রের প্রমাণ॥
দ্বাপর যুগেতে পরিচর্য্যা ধর্ম কয়।
কলিযুগে সংকীর্ত্তন জানিহ নিশ্চয়।"

নিত্যানন্দ ঘুরতে ঘুরতে এলেন অম্বিকা কালনায়। অম্বিকা কালনায়, কাটোয়ায় তখন সংস্কৃত চর্চ্চার পীঠস্থান। এ পাড়ায় ও-পাড়ায় টোল। নিত্যানন্দ ঘুরছেন সর্ব্বত্র। মহাপ্রভুকে ছেড়ে আসার পর তাঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে একজায়গায় তিনি থাকতে পারছেন না।

এক একবার ভাবেন আবার তিনি তীর্থ পরিভ্রমণে বের হবেন, আবার ভাবেন তাহলে তো মহাপ্রভুর আদেশ পালন হবে না। সংসার ছাড়বার জন্য সবাই পাগল আর মহাপ্রভু কিনা আদেশ দিলেন সংসারী হতে। সংসার বদ্ধজীব দিনরাত কি জালায় জ্বলছে, নিতাই তা জানেন। সংসারের মায়ায় জড়িত থাকে বলেই না ধর্মপথের কথা মনে থাকে না।

নিত্যানন্দ চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিলেন।

কে বলে দেবে কোনপথে যাবেন তিনি!

হৃদয়ের ভিতর কে যেন তাঁর বলে ওঠে—পথ নির্দেশ তো তুমি পেয়েই গেছো, তবে চিন্তা কিসের। তোমার জন্য মেয়ে ঠিক হয়েই আছে এই অম্বিকা কালনায়, যাও, তাকে বিয়ে কর।

নিত্যানন্দর চমক ভাঙে।

অম্বিকা কালনায় তার বিয়ে হবে। কে সে ভাগ্যহীনা যে এই পাগলকে বরণ করবার জন্য বসে আছে।

নিত্যানন্দ আরও চঞ্চল হলেন।

এর চেয়ে বৃন্দাবনের লীলাই ভাল ছিল। এর চেয়ে মথুরার খেলাই ছিল বেশী আনন্দের। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগে যা হল না, কলিতে এসে তাই হলো।

নিত্যানন্দ সবই জানেন—

তাই আজ তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—

নিমাই যখন নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করলেন সেদিন বীরভূমের একচাকা গ্রামে তিনি এমন হুংকার ছেড়েছিলেন যে গ্রামের লোক তা শুনেছিল।

তখন তাঁর বয়স সাত কি আট।

সেচিৎকারের মানে বোধ হয় অন্য রকম ছিল।

হয়তো নিত্যানন্দ আঁৎকে উঠেছিলেন—

ভেবেছিলেন বোধ হয় যে এবার তাঁর কঠিন দণ্ডই ভোগ করতে হবে।

সংসার যে চায়না, সংসার যাকে চায়না তাঁর পক্ষে বিবাহ একটা দণ্ড বইকি।

শুভলগ্নে অম্বিকা কালনায়······সরখেলের সুলক্ষণা কন্যাদ্বয় বসুধা ও জাহ্নবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল।

ঘর যার নেই তার হোল ঘরণী!······

মহাপ্রভু তখন হয়তো নীলাচলে, আর তাঁর নিত্যানন্দ শুরু করলেন সংসার সংসার খেলা।

নিত্যানন্দ এলেন খড়দহে—

খড়দহে আসা নিয়ে নানানরকম প্রবাদ আছে—

সেগুলির কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এর মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তারও কোন প্রমাণ নেই। প্রবাদ আছে যে নিত্যানন্দ খড়দহে এসে কারও কারও কাছে একটু বাস করার জমি ও কিছু খড় ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে তা দিতে স্বীকৃত হয়নি। পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

একজন নাকি কয়েক-গোছা খড়—তাঁর সামনে গংগায় ছুঁড়ে ফেলে বলেছিলেন : এই নাও খড়, যাও ঘর বাঁধগে।

কয়েকদিন পর নাকি গঙ্গার অনেকখানি জায়গা জুড়ে চড়া পড়ে যায়। সেই চড়াতেই নাকি নিত্যানন্দ ঘর বেঁধেছিলেন।

নিত্যানন্দ যে কী বস্তু তা তো তারা সেদিন বুঝতে পারে নি। জলে স্থলে অনলে-অনীলে যার স্থিতি তাঁকে ঘর বাঁধার জায়গা কেউ দিতে পারে ?

॥ একাদশ ॥

খড়দহের ঘাটে নিত্যানন্দ নিত্য স্নান, আহ্নিক করেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে বড় একখণ্ড পাথর এসে ঘাটে লেগেছে। কেন জানি তাঁর কৌতূহল হল, পাথরটাকে তুলে নিয়ে তিনি বাড়ি এলেন। পাথরটার মাঝখানে একটা চেরা দাগ।

আঘাত করলেন নিত্যানন্দ পাথরের ওপর।

দু'ভাগ হয়ে গেলো পাথর।

মাঝখানে রয়েছেন শ্যামসুন্দর।

নিত্যানন্দ বুকে তুলে নিলেন শ্যামসুন্দরকে।

সেই শ্যামসুন্দর মূর্তি উনি প্রতিষ্ঠা করলেন।

বর্তমানে যে শ্যামসুন্দর মূর্তি আছে খড়দহে সেই মূর্তি নিত্যানন্দের পাওয়া সেই গংগায় ভেসে আসা মূর্তি।

"জাহ্নবীর দুইকুলে যত আছে গ্রাম।
সর্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতিধাম॥
যেদিকে চাহেন দুই কমল নয়নে।
সেইদিকে প্রেমবর্ষে ভাসে সর্বজনে॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবার হইল সর্বশক্তি অধিষ্ঠান॥
সবে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥

যে নিত্যানন্দকে একদিন সবাই পাগল ভেবেছিল আজ সেই নিত্যানন্দের সঙ্গলাভের জন্য সবাই পাগল হয়েছে। নিত্যানন্দের কৃপা কি এতই সহজ লভ্য? যে তাঁর ভাবের ভাবি হতে পারে, যে

তাঁর নিত্য আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে সেই হয়তো কিছুটা কৃপা লাভ করতে পারে। যিনি অবধূতাচার্য, যিনি বাউলের গুরু, তিনি যে অসাধারণ পুরুষ। তিনি যে অবিনশ্বর পৌরুষযুক্ত মুক্ত-পুরুষ। তাঁকে ধরতে গেলে, তাঁর ধ্যানধারণার ধারক বাহক হতে হবে!

নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে এলেন। একবার এসেছিলেন মহাপ্রভুর সাথে। তিন মাস ছিলেন। নাম, গান, নৃত্যে ভরপুর ছিল পানিহাটি গ্রাম তিন মাস।

"তিন মাস কারো বাহ্য নাহি শরীরে।
দেহধর্ম তিলার্দ্ধেক কারো নাহি স্ফুরে॥
তিনমাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমে সুখে নৃত্য বই নাহি আর॥"

নামে ক্ষুধা, নামে ক্ষুধানাশ; নামে দুই-ই সম্ভব।

সেই নাম যাদের হৃদয়ে তাদের কাছে বিশ্বসংসার, আত্মীয়-পরিজন সব কিছুই বিস্মৃতির অতলে।

নিত্যানন্দের চোখ ফেটে জল আসে পানিহাটির মাটিতে দাঁড়িয়ে। এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করেন শুধু। চোখের জলে বুক ভাসে।

নিত্যানন্দ কাঁদতে কাঁদতে বলেন—তোমরা নাম করো। মহাপ্রভু বলে গেছেন আমি তোমাদের ছাড়া কখনও হবো না। যেখানে নাম সংকীর্তন সেখানেই আমি।

সকলে কীর্তন শুরু করে—

"নগর ভ্রমিয়া আমার গৌর এলো ঘরে।
ও প্রাণগৌর এলো ঘরে। আমার নিতাই এলো ঘরে।
ঘরে ঘরে নাম প্রেম বিলাইয়ে।
গৌর এলো ঘরে আমার নিতাই এলো ঘরে।

নাম প্রেম বিলাইয়ে নিতাই গৌর এলো ঘরে।
অমনি ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।
বলে, ও কে এলো রে।"

সকলের সঙ্গে নিত্যানন্দ নৃত্য করছেন।
ভাবেতে বিভোর হয়ে নৃত্যপাগল নিত্যানন্দ নাচছেন।
সে রূপ যে দেখেছে সেই ভুলেছে।
এমন রূপ-শোভা নিত্যানন্দেই সম্ভব কোন মানুষে সম্ভব নয়।
নিমাই নিতাই।
ভগবান আর ভক্ত।
প্রেম আর মহাপ্রেম।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিয়েছেন সন্ন্যাস।
আর প্রভু নিত্যানন্দ বিবাগী ভ্রমর।
একজন ঘর ছেড়েছেন আর একজন ঘর বেঁধেছেন।
কৃষ্ণ নামের বেড়া দেওয়া শক্ত ঘর।
যেখানে বসে তিনি ডাকছেন সবাইকে আশ্রয় নিতে।
এই ঘরই তো কলির জীবের নিরাপদ আশ্রয়। ঝড়ে উড়বে না। আগুনে পুড়বে না।
নিত্যানন্দ ঘরামী।

"প্রণমিহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
হরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার॥
কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়।
শচীগর্ভ সিন্ধুমাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপতাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
ভকত চকোর তায় মধুপান কৈলা।
অমিয়া মাথিয়া তাহা বিস্তার করিলা॥

পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈলা অদ্বৈত তাহায় ॥
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন!
প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ পতিত পাবন ॥
নদী-নালা সব আসি হৈলা এক ঠাঁই
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঁঞি।"

তোমরা সাজো সবাই। যে যেখানে পাপী-তাপী আছো, কৃষ্ণ-প্রেমের অভিসারে যেতে হবে। ভবসমুদ্রে নিত্যানন্দ মাঝি এসেছে হরিনামের নৌকা বেয়ে। সব পড়ে থাক—চৈতন্যের ঘাটে পৌঁছাতে হলে উঠে পড়ো।

সময় চলে যায়।

পারের কড়ি কৃষ্ণনাম।

ঐ নামেতেই তোমার ভববন্ধন মুক্তি। ঐ নামেই তোমার পাপ-মোচন।

নিত্যানন্দ পথে চলেছেন।

যাকে দেখছেন তাকেই আলিঙ্গন করছেন। কে শুচি কে অশুচি; কে ছোট, কে বড় কোন বিচার নেই।

নিত্যানন্দর সাথে আলিঙ্গন মানে কৃষ্ণের সাথে আলিঙ্গন; নিত্যানন্দর স্পর্শ মানে কৃষ্ণপরশ।

নিত্যানন্দ চিন্তা মানে কৃষ্ণ চিন্তা। নিত্যানন্দ ভাবনা কৃষ্ণ ভাবনা; নিত্যানন্দ মনন কৃষ্ণ মনন।

"মহাপাপী দুরাচার হয় যেইজন
সে যদি হৃদয়ে হরি করয়ে স্মরণ!
তখন পরমগতি সে জন পাইবে
কৃষ্ণের বচন ইহা অন্যথা না হইবে।

এই কলিকাল হয় দোষের আকার
কিন্তু একগুণ তাহে আছে চমৎকার ॥
যেই মাত্র কৃষ্ণ নাম বদনে লইবে
ভববন্ধন হতে মুক্তি সে পাইবে ॥
সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান করিবে নিয়ত
ত্রেতায় যজ্ঞেতে কৃষ্ণে অর্চিবে শত্তত ॥
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা শুনহ রাজন
কলিতে জানিবে মাত্র নাম উচ্চারণ ॥”

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের নাম-গানে পাগল করে তুললো সবাইকে। নামের বন্যা বয়ে যায় খড়দা থেকে পানিহাটি। পানিহাটি থেকে অম্বিকা-কালনা। অম্বিকা-কালনা থেকে কাটোয়া। কাটোয়া থেকে শান্তিপুর ফুলিয়া।

দলে দলে সবাই এসে নিত্যানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। নিত্যানন্দ সবাইকে দীক্ষা দিলেন কৃষ্ণনামে।

এই নামই দীক্ষা। এই নামই শিক্ষা। এই নামই ভিক্ষা। এই তো মন্ত্র। এই তো তন্ত্র। দেহযন্ত্রের এই তো মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রেই দেহ চলবে। এই মন্ত্রেই মন-প্রাণ দুলবে। এই মন্ত্রে বিষয় বৈভব ভুলবে।

এমন মন্ত্র ত্রিভুবনে কি আর আছে?

নিত্যানন্দ কেঁদে নাম বিলাচ্ছেন—এসো তোমরা এই নামের তরীতে যাত্রী হও—কান পেতে শোন, নদীর ঢেউয়ে কৃষ্ণ নাম। বাতাসে কৃষ্ণ নাম। বৃক্ষপত্রেও কৃষ্ণনাম। আমি যেমন কাঁদছি, তোমরাও তেমনি কাঁদো। গৃহী, ত্যাগী, ভোগী, যোগী সবাই কাঁদো। প্রেমের ঠাকুরের এই ভিক্ষা। আদেশ নয়। এবার কলিতে চোখের জলে কৃষ্ণ দরশন। কৃষ্ণ পরশন। ঐ শোন মৃতপ্রায় জীবের ক্রন্দন—কাকের কাছে আবেদন করছে।

কাতরে অনুনয় করছে—

"সর্ব অংগ ঠুকরে খেয়ো
রেখোনা কিছু বাকী।
শুধু আঁখি দুটো রেখো বাকী
কৃষ্ণদরশন লাগি ॥"

এবার বলরাম নিত্যানন্দ হয়ে মানব জমি কর্ষণ করার ভার নিয়েছে। কৃষ্ণ নামের লাঙ্গল এবার কাঁধে—তোমাদের দেহের পতিত জমি এবার চাষ করিয়ে লও নিত্যানন্দকে দিয়ে। আর বার বার আসতে হবে না। আর বার বার ঘর বাঁধতে হবে না। আর বার বার আমার আমার করে কাঁদতে হবে না।

"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নাম হাট জীবের কারণ ॥
শ্রদ্ধাবান জন হে! শ্রদ্ধাবান জন।
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্ব ধর্ম সার ॥"

## ॥ দ্বাদশ ॥

বসুধা ও জাহ্নবী যেন ত্রিপত্র বিল্বপত্রের গাছের দুটি পাতা, মাঝে নিত্যানন্দ। তিনজনই একত্রে কিন্তু কেউ যেন কারও নয়।

সংসার পেতেছে নিত্যানন্দ কিন্তু সংসারী হলো কই? সংসার সবাই পাতে কিন্তু সংসারী হতে পারে কজন?

নিত্যানন্দ থেকেও নেই। বসুধা আর জাহ্নবী দুজনই নিত্যানন্দের সেবা করেন। দুজনেই তাঁর পরিচর্যা করেন—নিত্যানন্দ তাদের সেবা গ্রহণ করেন।

জাহ্নবী মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে নিত্যানন্দের দিকে চেয়ে থাকেন। এ রূপ তিনি আগেও দেখেছেন। এখনও দেখছেন।

নিত্যানন্দ হাসেন।

জাহ্নবীও হাসেন।

যেন অনেকদিন পরে দেখা।

নিত্যানন্দ বলেন—কৃষ্ণকে ডাক। কৃষ্ণকে ভজনা কর। কৃষ্ণ সেবা করো। সব কি ভুলে গেলে!

জাহ্নবী চেয়ে থাকেন নিত্যানন্দের দিকে—

নিত্যানন্দ আবার বলেন—এ ছাড়া আর তোমার কাজ কি! তুমি নিজে এ কাজ করো। অপরকেও শেখাও।

জাহ্নবী অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন—তুমি কে?

—আমি কৃষ্ণের সেবক! এ ছাড়া আবার আমার পরিচয় কি।

—তুমিই তো কৃষ্ণের অংশ। কৃষ্ণ তো তোমার ভিতরেই বাস করেন। কৃষ্ণ তো তোমার সর্বদেহে।

নিত্যানন্দের দুচোখ বুজে আসে।

বন্ধ-চোখের কোণ দিয়ে জল গড়ায়।

নিত্যানন্দ সেই অবস্থায় বলেন—জাহ্নবী, তোমাকে আমি চিনি। দ্বাপরে বৃন্দাবনে তুমিই তো ছিলে ললিতা সখী। তোমার কৃষ্ণ-প্রেমের কথা কে না জানে! তোমাকে যে জেনেছে সেই তো কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান জানে। জাহ্নবী! কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়েছে তুমি কি বৃন্দাবনে থাকতে পারো। তাইতো তোমাকেও আসতে হয়েছে।

জাহ্নবীর চোখেও জলের ধারা।

—তুমি এসব কি বলছ? আমি তো বুঝতে পারছি না। এ আমি কোথায় এলাম। কতদিন তাঁকে দেখিনি। কোথায় গিয়ে লুকালেন তিনি। বল, সে নিঠুর কালিয়া এবার কোথায় এসে লুকিয়েছেন।

জাহ্নবী মুর্চ্ছা গেলেন।

নিত্যানন্দ তার মূর্চ্ছিত দেহ কোলের ওপর রেখে বললেন—পাবে পাবে, দেখা নিশ্চয়ই পাবে। তোমাকে দেখা তাঁর দিতেই হবে।

## ॥ ত্রয়োদশ ॥

শ্রীরাঘবানন্দর বাড়িতে এলেন প্রভু নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ বললেন—কীর্তন করতে হবে। পানিহাটির সব লোককে এই কীর্তনের আসরে নিমন্ত্রণ জানাও।

শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া মাধব ঘোষ এলেন। তিনি বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া।

তিন ভাই—মাধব; গোবিন্দ, বাসুদেব এলেন। কীর্তন শুরু করলেন তিন ভাই। নিত্যানন্দ নাচতে থাকেন। পৃথিবী যেন তাঁর নাচে কেঁপে কেঁপে ওঠে!...... ..

অবাক বিস্ময়ে সকলে চেয়ে থাকে।

কীর্তনের সংগে এমন নৃত্য এর আগে কেউ দেখেনি! মনে হয় কৈলাস থেকে বুঝি ভোলামহেশ্বরই মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন। খোল-করতালের শব্দে চারিদিক আনন্দ-মুখর। সবার যেন বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে।

নাচতে নাচতে নিত্যানন্দ খট্টার উপর উঠে বসলেন। অভিষেক করতে আদেশ দিলেন রাঘব পণ্ডিতকে। সহস্র ঘটে করে জল এলো। এলো বনফুল ঝুড়ি ঝুড়ি। এলো সুবাসিত চন্দন।

নতুন বস্ত্র পরানো হোল। শ্রীঅংগে চন্দন লেপে দেওয়া হল। দুই হাতে দেওয়া হলো বনফুলের বাজু। গলায় পরিয়ে দেওয়া হলো সুগন্ধি ফুলের মালা। সারা কপালে দেওয়া হলো চন্দনের ফোঁটা। কালো চোখে মাখিয়ে দেওয়া হল কাজল।

একি অপরূপ বেশ!

মানুষের মাঝে যেন দেবতারই আবির্ভাব হয়। এ হেন জনের

যাঁরা সঙ্গলাভ করেন তাঁদের জীবন ধন্য। তাঁদের জীবনের সব আশা পূর্ণ।

"যে কোন স্থানে যদি নিত্যানন্দ সংগ হয়
সেই স্থান সর্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদিময় ॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥"

কৃষ্ণময় নিত্যানন্দ দর্শনই তো কৃষ্ণ দর্শন।

নিত্যানন্দ আনন্দময়।

সেই আনন্দময় নিত্যনন্দই তো কৃষ্ণ। তিনিই তো মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

গলে বনমালা, কপালে বর্চ্চিত চন্দন।

নিত্যানন্দের মাথায় ছত্র ধরলেন শ্রীরাঘবানন্দ।

কীর্তন মুখরিত প্রাঙ্গণ অংগন।

এমন সময় নিত্যানন্দ বললেন—কদমফুলের মালা গেঁথে আনো! কদমফুলেই যে আমার নিত্যবসতি।

রাঘব পণ্ডিত হাত জোড় কোরে বললেন—প্রভু! এ তো কদমের সময় নয়। কদমফুল কোথায় পাবো?

নিত্যানন্দ বলেন—বাড়ির আশপাশ খুঁজে দেখো, কোথাও নিশ্চয়ই ফুটে আছে।

রাঘবানন্দ চিন্তিত মনে বাড়ির ভিতর তাকান আর মনে মনে ভাবেন—একি আদেশ প্রভুর।

বাড়ির বাহিরে বাগানে এসে দেখেন জম্বীরের গাছে অজস্র কদমফুল ফুটে আছে!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান রাঘবানন্দ।

প্রভুর কৃপা হলে সবই হয়।

তিনি কদমফুলের মালা গেঁথে এনে নিত্যানন্দের গলায় পরিয়ে দেন।

চারিদিকে অপূর্ব গন্ধে ভরে যায়। সকলে যেন কি এক মধুর গন্ধ অনুভব করে।

"হেসে নিত্যানন্দ বলেন—আরে ভাইরে
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব।"

সকলে করযোড়ে বলে—সত্যিই প্রভু এক অপূর্ব দনার গন্ধ পাচ্ছি।

নিত্যানন্দ হাসছেন আর বলছেন—এ অপরূপ গন্ধের পরমরহস্য শোন, মহাপ্রভু চৈতন্য আজ একটু আগে নীলাচল থেকে কীর্ত্তন শুনতে এসেছিলেন। তাঁর গলায় ছিল দিব্য দমনক মালা। তোমাদের নৃত্য দেখবার জন্য স্বয়ং তিনি এসেছিলেন।

নিত্যানন্দ কেঁদে উঠলেন—পানিহাটির এ মাটি আজ তীর্থস্থানে পরিণত হলো। মহাপ্রভুর শ্রীচরণরেণু পড়েছে এই মাটিতে।

নিত্যানন্দ খট্টা থেকে নেমে এসে গড়াগড়ি খান উঠানে। দেখতে দেখতে সবাই এসে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। এ মাটির পরশ অমৃত পরশ। এ মাটির পরশ শ্রীকৃষ্ণ পরশ।

## ॥ চর্তুশ ॥

নবদ্বীপের পথে খড়দহে এলেন নিত্যানন্দ। পুরন্দর পণ্ডিত এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই নিত্যপূজার্চ্চনা করেন।

দেবালয়ে বালগোপাল মূর্ত্তি দেখে নিত্যানন্দ বিভোর হয়ে পড়েন। তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করতে করতে আছড়ে পড়েন বাঁধানো বেদীর ওপর।

পুরন্দর পণ্ডিত তাড়াতাড়ি তুলতে যান প্রভু নিত্যানন্দকে। কতখানি আঘাত লেগেছে কে জানে।

কিন্তু নিত্যানন্দ অক্ষত দেহে উঠে দাঁড়ালেন।

> "সত্যকৃষ্ণ ভাব হয় যাহার শরীরে
> অগ্নিস্পর্শ ব্যাঘ্রেও লঙ্ঘিতে নারে তারে।"

কৃষ্ণ ভাব যাঁর দেহে তাঁর গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগবে কি করে? কৃষ্ণ অভাবের দেহ এই কলির যুগের তারা শুধু ঘা খেয়ে খেয়েই চলেছে, কৃষ্ণভাবে যার ভাবনা তার আবার কিসের অভাব।

নিত্যানন্দ বললেন—পুরন্দর কলির জীব কৃষ্ণ নাম না নিলে আমি দেহত্যাগ করবো।

পুরন্দর হাতযোড় করে বলে—স্বয়ং প্রভু যখন নাম বিলাচ্ছেন তখন আর ভাবনা নেই।

খড়দহে থাকাকালীন জাহ্নবীর গর্ভে নিত্যানন্দের একমাত্র পুত্র বীরভদ্রের জন্ম হয়। কেউ বলেন, একথা ঠিক নয়।

প্রবাদ আছে যে নিত্যানন্দ একদিন গঙ্গায় স্নান করবার সময় একটা মৃত শিশুকে ভেসে আসতে দেখেন। সেই মৃত শিশুকে তিনি তুলে নিয়ে এসে জীবন দান করেন। সেই শিশুই বীরভদ্র নামে পরিচিত হয়।

কেউ বলেন—এটাও ঠিক নয়। প্রথমটাই ঠিক, খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দির চত্বরে একটা থামের ভিতর নাকি বীরভদ্রের নাড়ী পোঁতা আছে। কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ঠিক নয় কে সঠিক বলবেন জানিনা।

খড়দহ থেকে নিত্যানন্দ এলেন আদি সপ্তগ্রামে। সপ্তঋষির স্থান ত্রিবেনীঘাট, সেখানে তিনি স্নান করলেন।

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে চণ্ডী মা বিরাজ করছেন। বণিক-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উদ্ধারন দত্ত—

কোন কিছুর অভাব নেই—ধন ঐশ্বর্য্য সব যেন তার কাছে বাঁধা।

তিনি নিত্যানন্দের সাদর সেবা করলেন।

মন্দিরে চণ্ডিমা নানান অলংকারে ভূষিতা। নিত্যানন্দ মন্দিরে বসে দেখছেন প্রতিমা। সহসা তাঁর ভাবাবেশ হল। দেখলেন শ্যামার জায়গায় শ্যামসুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন।

নিত্যানন্দ মুর্চ্ছা গেলেন।

উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের সেবা করলেন মনপ্রাণ দিয়ে। তাঁর কৃপায় সমস্ত বনিক সমাজ উদ্ধার হয়ে গেল।

হিরণ্য পণ্ডিত নামে ব্রাহ্মণ কিন্তু দস্যুর সর্দ্দার তিনি। মনে মনে দলবল নিয়ে ফন্দী করে চণ্ডীমায়ের গহনা চুরি করতে হবে, সেইসাথে নিত্যানন্দর যা কিছু আছে তাও আত্মসাৎ করতে হবে।

একদিন নিশুতি আঁধার রাতে হিরণ্য পণ্ডিত সবাইকে নিয়ে মন্দিরের আশপাশে আত্মগোপন করে। কিন্তু নিত্যানন্দ সেই যে কীর্ত্তন শুরু করেছেন তা আর মোটে থামেই না।

হিরণ্য পণ্ডিত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সারারাত যদি কীর্ত্তন করে তাহলে তারা কার্য্যসিদ্ধি করবে কখন।

হিরণ্য পণ্ডিত নির্দেশ দেন সবাইকে—যে যেখানে আছো সজাগ থাকো। কীর্ত্তন আর বেশীক্ষণ হবে না—তারপরই কাজ শেষ করতে হবে।

রাত বেড়ে চলে। কীর্ত্তনও থেমে যায়। বন-জংগলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে, আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

কিন্তু কোথায় গেল হিরণ্য পণ্ডিত আর তার দলবল। নিত্যানন্দের ইচ্ছায় তারা তখন গভীর ঘুমে অচেতন, সকালে দেখা গেল হিরণ্য পণ্ডিত আর তার দলবল সব বনজংগলের আশপাশে অচেতন হয়ে রয়েছে ঘুমে।

বাইরে তখন রোদ্দুরে ভরে গেছে।

## ॥ পঞ্চদশ ॥

নিত্যানন্দ শান্তিপুর এলেন। অদ্বৈতাচার্যকে সাথে নিয়ে সেখান থেকে এলেন নবদ্বীপ।

শচীমাতা যেন তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন! বললেন—অন্তর্যামী তুমি, তোমাকে আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করেছিল তাই তুমি এসেছো। দেখে যাও আমি কেমন আছি।

নিত্যানন্দ জবাব দেন—আমারও বড় দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকে, তাই তো ছুটে এসেছি মা।

—আবার কোথায় যেতে হ'বে?

—মা, নীলাচলে যাবো।

—নীলাচলে!

শচীমাতা কেমন যেন হয়ে গেলেন।

পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ক'দিন থাকোনা আমার কাছে।

—না মা, আজই যাবো!

—ওরে! আজ যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা, আজ না হয় নাই গেলি। আজ যে আমার গোরাচাঁদের জন্মতিথি।

শচীমাতার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে।

নিত্যানন্দ বলেন—তবে তো আজই রওনা হতে হ'বে। আজকের মত অন্যদিন কি আর আছে।

"নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্বযাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব্ব শুভলগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করি যে সেবন।
কৃষ্ণে ভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥"

শচীমাতা কাঁদছেন—

নিত্যানন্দ শচীমাতার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেন—মা, তোমাকে কাঁদিয়েই তো আমাদের শান্তি। তুমি না কাঁদলে তো জগৎ কাঁদবে না। তুমি না ভাবলে তো এ কলির জীব ভাববে না। তোমার চোখের জলের ধারা যত বেগবান হবে জীব তত নাম করবে। তোমার চোখের জলেই তো জীবের মুক্তিস্নান।

নিত্যানন্দ হাসছেন।

শচীমাতা কাঁদছেন।

কিছু পরে চোখের জল মুছে বললেন শচীমাতা—তোকে কে বুঝবে রে, তোকে কে জানবে রে। যে জানবে সে তো বাঁচবে। তুই যে কী তা কি আর আমি জানিনারে !······

"চৈতন্য কৃপায়ে হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ নাহি কতি।
সংসারে পার হঞা ভক্তির সাগরে
যে ডুবিত সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥"

## ॥ ষোড়শ ॥

নীলাচলে মহাপ্রভু চৈতন্য একটা নিমগাছের তলায় বসে আছেন। অদ্বৈতাচার্য আর নিত্যানন্দ দুজনে দুপাশে বসে আছেন।

মহাপ্রভু বলছেন—শোন অদ্বৈতাচার্য, শোন নিত্যানন্দ, এবার আমার অন্তিম সময় এসেছে। এ দেহভার আর আমি বহন করবো না। বৈকুণ্ঠে যাবার ডাক এসেছে। আর দেরী করো না। এই নিমগাছের নীচে শয্যা রচনা কর। নিমগাছ আমার বড় প্রিয়, তাই এই গাছের তলায় আমি দেহ রাখতে চাই। গংগা-জল দিয়ে আমাকে স্নান করাও। মাথার কাছে একটা তুলসী গাছ রাখো। সারা-অংগ তিলকচন্দন লেপে দিয়ে কানে আমার হরিনাম দাও।

এই কথা বলে মহাপ্রভু চৈতন্য নিমগাছের তলায় শুয়ে পড়লেন।

মহাপ্রভুর কি অপরূপ লীলা।

নিজে স্বয়ং হরি হয়েও কর্ণে হরিনাম দিতে বলছেন। নিত্যানন্দ কাঁদছেন। বালকের মত কাঁদছেন।

মহাপ্রভু বললেন—নিতাই তুমি কাঁদছো। তোমার মত সবাই যদি কাঁদতে পারতো তাহলে কলির জীব উদ্ধার হত।

নিত্যানন্দ বললেন—প্রভু, আমার কি গতি হবে? তোমার সংগে আবার আমার কি ভাবে সাক্ষাৎ হ'বে? যুগে যুগে আমি তোমার চরণের দাস। কিন্তু এখন আমাকে ছেড়ে কোথায় তুমি চলেছো—তোমার বিহনে আমি কি করে জীবন ধারণ করি। ত্রেতাযুগে রাম অবতারে আমি লক্ষণ হয়ে তোমার সেবা করেছিলাম। দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতার হয়ে বলরাম রূপে তোমার পাশে ছিলাম। কলিতে গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হলে আমিও নিতাই রূপে তোমার শ্রীচরণ যুগল সেবা করলাম। যুগে

যুগেই আমি তুমি ছাড়া নয়, আর এখন তোমার এ দাসকে ছেড়ে, কলির জীবের কানে মহানাম মন্ত্র দিয়ে বৈকুণ্ঠে চললে। আমাকে তুমি সঙ্গে নাও। তোমাকে ছাড়া আমার এ দেহ নয়—আমাকে সাথে নিয়ে তোমার পদসেবা করবার অধিকার দাও।

নিত্যানন্দের কাতর ক্রন্দনে মহাপ্রভু বড় অস্থির হয়ে পড়লেন।

তিনি ধীরে ধীরে বললেন—প্রাণের ভাই নিতাই, তোমায় আমি কি করে ছাড়বো! তোমার জন্যই এ ধরাধামে আমাকে থাকতে হ'বে। উৎকলরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় হরিমূর্তি স্থাপন করেছেন—জগন্নাথ আর বলরাম তাতে শোভা পাচ্ছে। আমি জগন্নাথ আর তুমি বলরামে থাকবে—আর জগতের লোক সেই রূপ দর্শন করে আর পুণর্জন্ম লাভ করবে না। বাজারে প্রসাদ বিক্রি হ'বে আর সবাই সেই প্রসাদ এক সংগে বসে খাবে—মুচিতেও প্রসাদ দিলে ব্রাহ্মণে খাবে।

এইসব কথা বলতে বলতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের কোলে চোখ বুজলেন।

নিত্যানন্দ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন মহাপ্রভুর মুখের দিকে। এক অপূর্ব জ্যোতিতে যেন দশদিক ভরে গেছে। নিত্যানন্দের কোলে যেন একরাশ ফুল পড়ে আছে।

নিমাই আর নিতাই।

নিতাই আর নিমাই।

কলিতে এই দুই-জনই নাম বিলিয়ে কলির জীবের শুষ্ক হৃদয়ে নামের বীজ বপন করলেন। জীবনে মরণে এই নামই সবার জপমালা হয়ে রইল। শয়নে-স্বপনে এই নামই সার! এই নামের বৈঠা বেয়েই জীব এ ভবনদী পার হতে পারে। শোক-তাপদগ্ধ মানুষ যেদিন এ ভাবরঙ্গমঞ্চের সাজ ফেলে পারের ঘাটে

গিয়ে দাঁড়াবে, পারের মাঝি প্রভু নিত্যানন্দের আশায় সেদিন যেন সে উচ্চৈঃস্বরে বলতে পারে—

প্রভু নিত্যানন্দ তুমি পারের মাঝি হয়ে আমাকে চৈতন্যের ঘাটে নামিয়ে দাও। এ ছাড়া আর আমার কোন কামনা নেই। কোন বাসনা নেই।

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্রাহি মাং॥
রামরাঘব, রামরাঘব, রামরাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাং॥
ওঁ শান্তি !!!

সমাপ্ত